ফেস বাই ফেস

মাহবুব মোর্শেদ

ফেস বাই ফেস

উৎসর্গ

রৌহা অনামিকা সরকার

ফেস বাই ফেস

মাহবুব মোর্শেদ

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০১০

ভাষাচিত্র, ঢাকা

প্রথম অনলাইন সংস্করণ

অক্টোবর ২০১১

বইয়ের দোকান, ঢাকা

স্বত্ত্ব

নিভৃত অনুরণন

কৃতজ্ঞতা

উৎপল কুমার বসু

উপন্যাসে ব্যবহৃত অধিকাংশ কবিতার লাইন উৎপল থেকে উদ্ধৃত

গৌতম চৌধুরী

তার ধরিয়ে দেয়া দুটি ভুল অনলাইন সংস্করণে সংশোধন করা হলো

যোগাযোগ

mahbubmorshed@ymail.com

অনলাইন সংস্করণ বিনামূল্যে বিতরণ ও পাঠের জন্য উন্মুক্ত। এই সংস্করণটি বিক্রি করা যাবে না। কাগজে ছেপে বাণিজ্যিক উদ্দেশে প্রচার করতে হলে অবশ্যই লেখকের অনুমতি নিতে হবে। বইটির প্রিন্ট কপির জন্য http://aronibooks.com/ সাইটের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

ফেস বাই ফেস

দূর থেকে হাত তোলো। যদি পারো জানাও সম্মতি

জরুরি অবস্থার মধ্যে এই রকম হয়, হতে পারে। রবিবার সকাল আটটা ষোলো থেকে আটটা চব্বিশ এই আট মিনিটে তিনবার ঘটনাটা ঘটে। জিন্সের পকেটে রাখা মোবাইল ফোনে পরপর তিনটা কল আসে। কোনো বিরতি না দিয়ে পরপর ফোনে ভাইব্রেশন হলে আমার ধারণা হয় যে হয়তো একই ব্যক্তি তিনটা কলই করছে। এত সকালে তিনজন ভিন্ন ব্যক্তির উপর্যুপরি আমার কথা মনে পড়ার সম্ভাবনা নেই। পরপর তিনবার কোনো বিরতি না দিয়ে ফোন আসায় আমার ধারণা হয়, খুব জরুরি দরকারে ফোনটি আসতে পারে। হয়তো কোনো দুঃসংবাদ দেয়ার জন্য কেউ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু এমন সব ক্রান্তিকালে ফোন বাজে যে– ধরা তো দূরে থাক, দেখার ফুরসতও পাই না যে, কে এই সকালে আমার কথা মনে করে বার বার ফোন দিচ্ছে। বাসা থেকে বেরিয়ে মোহাম্মদপুরে বাবর রোডের মাথায় রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে মিরপুর রোড ক্রস করার জন্য আমি যখন ডানে-বামে ক্রমান্বয়ে তাকাচ্ছি তখন প্রথম কলটি আসে। অত্যন্ত সাবধানে রাস্তার ডিভাইডারের ওপর দাঁড়িয়ে আমি যখন বাম দিক থেকে আসা বাসগুলো দেখে দেখে কলেজ গেটের দিকে পা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছি তখন ভাইব্রেশন মোডে রাখা ফোনটা দ্বিতীয়বারের মতো ক্রমান্বয়ে কেঁপে ওঠে।

রাস্তায় স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের সবুজ ওভারকোট পরা ঝাড়ুদার দল ফুটপাথের পাশে আলতো করে ঝাড়ু বোলাচ্ছে। ময়লা পরিস্কার হোক বা না হোক যথেষ্ট ধুলা উড়ছে তাতে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ট্রাক-বাসগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে। ভিড়ের রাস্তায় সাবধানতা একটু কম থাকলেও চলে, কিন্তু ফাঁকা রাস্তায় অতি সাবধানে রাস্তা পার হতে গিয়েও শিশুমেলার দিক থেকে আসা একটি আন্তঃনগর বাস আমাকে প্রায় চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দ্রুত ডিভাইডারে ফিরে প্রাণ রক্ষা করি আমি। বাসের গতি এবং বামে তাকিয়ে রাস্তা পার হতে নেয়া সময়ের মিল না হওয়ায় ঘটনাটা প্রায় ঘটতেই যাচ্ছিল। কিন্তু ড্রাইভার হালকা ব্রেক করায় আমি দ্রুত রোড ডিভাইডারের ওপর নিজেকে ফিরে পেলাম। রোড ডিভাইডার থেকে বামে তাকিয়ে রাস্তায় আবার পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেটে ফোনের কম্পন টের পেলাম। রাস্তা পার হওয়ার পুরোটা সময় ধরে ফোন আসার ঘটনা ঘটলে আমার মধ্যে একটু অস্বস্তি তৈরি হয়। সাধারণত মিটিংয়ে না থাকলে ফোন না ধরার ঘটনা ঘটে না।

কিন্তু আজ এমন অসময়ে ফোন এলো যে তিনবার বাজার পরও আমি ফোন ধরতে পারলাম না।

কলেজ গেটের টিকিট কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা হলো একবার দেখি এত সকালে কার এত জরুরি দরকার। পকেটে হাত ঢোকাতে যাব তখনই সিদ্ধান্তে দ্রুত পরিবর্তন এলো। ম্যানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দ্রুত কাউন্টারের লোকটির কাছে টিকিট চেয়ে বসলাম। কারণ গুলশান রুটের মহামূল্যবান, বিরল দর্শনধারী বাসটি এসে পড়েছে। তাড়াহুড়ো করে টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। যাত্রী ভরা বাসটি কাউন্টারের কাছে ভিড়তেই লাইনের লোকগুলো হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল দরজা লক্ষ্য করে। একজন-দু'জন ওঠার জায়গা ছিল ওইটুকু জায়গায় দশজন উঠে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম, দশজনের দলে আমিও আছি। পা দুটো রাখার কিংবা হাত দিয়ে ধরার কিছু পাওয়ার আগেই আবার ফোন কেঁপে উঠল। কোনোরকমে সিটের হাতলে হালকা ঠেস দিয়ে ফোন ধরার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। স্ক্রিনে নামটা ভেসে উঠেছে– মারুফ এসসিএইচ। মানে স্কুলের বন্ধু মারুফ। মনে মনে বললাম, আরে মারুফ। স্কুলের বন্ধু মারুফের নম্বর আমার ফোনবুকে সেভ করা আছে সেটা আমি ভুলতেই বসেছিলাম। সাধারণত বছরে দু'একবার অকেশনালি ফোন করে, কোনো প্রয়োজন ছাড়া। জাস্ট মনে পড়ে বলে। মারুফ যশোরে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি বুঝতে পারি না, রবিবার দিন সকাল আটটা ষোলো মিনিট থেকে ১২ মিনিটে সে কেন চারবার আমার ফোনে রিং করে বসে। কীসের জরুরি দরকার তার? ফোন ধরে হ্যালো বলার আগে মারুফ বলে–

তোমারে কতক্ষণ ধরে ফোন দিতেছি, ধরো না কেন?

আর বইলো না বন্ধু, বাসে একেবারে ভিড়ের মধ্যে ফানা হয়া আছি।

ও তুমি রাস্তায় নাকি? অফিস যাইতেছো? ওকে তাইলে আমি পরে ফোন দেই, কী বলো?

না না, বলো না। সমস্যা নেই। তবে কথা একটু জোরে বলো। কিছু শুনতে পাইতেছি না।

বন্ধু, আমি বরং পরেই ফোন দেই। তুমি অফিস যাও। আমি ঘণ্টাখানেক পর ফোন দিতিছি।

মারুফের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই খেয়াল করছিলাম দুটো লোক আমাকে দু'দিক থেকে চেপে ধরেছে। আমার মতোই তারা পা এবং হাত রাখার জায়গা পায়নি। কিন্তু সিটের হাতলে ঠেস দেয়ার সুযোগটা দু'জনেই নিতে চাইছে। আমি পকেটে ফোন রেখে দু'জনের উদ্দেশেই মোচড় দিলাম। তাতে আমার জায়গাটা স্থির হলো। আমার ডানে আছেন শার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক, হাতে ল্যাপটপের ব্যাগ, বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ল্যাপটপ আছে। নিজে দাঁড়াতে পারলেও ব্যাগটার ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে সেনসেটিভ ব্যাগটা প্রায় ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ল্যাপটপ নিয়ে ভিড়ের বাসে সাধারণত কেউ ওঠে না। হয়তো অফিসে যাওয়ার তাড়া আছে আর রাস্তায় সিএনজি-স্কুটার-ট্যাক্সিক্যাব কেউ গুলশান-বনানী যেতে রাজি

না হওয়ায় বাসে উঠেছে। ল্যাপটপ নিয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির জন্য কিছুটা মায়া জন্মালো। কিন্তু কিছু করার নেই। পুরো রাস্তা তাকে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমার ডানে দাঁড়িয়েছে একটা স্মার্ট ছেলে। তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিপাটি পোশাক-আশাক। কিন্তু ছেলেটি প্রচুর ঘামছে। কপাল বেয়ে ঘাম নেমে ওর পুরো মুখটা ভিজিয়ে দিয়েছে। শার্টও পুরোটা ভিজে গেছে। ভেতরের স্যান্ডো গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। আজকাল লোকে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে কি-না তা নিয়ে আমার মনে কিছুটা সংশয় ছিল। স্মার্ট ছেলেটির ভেজা শার্টের অন্তরালে স্যান্ডো গেঞ্জি দেখে একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম। ব্রুট ধরনের কোনো কড়া সেন্ট নিয়েছে ছেলেটি। সেন্টের গন্ধের সঙ্গে ঘামের হালকা রসুনের গন্ধ মিলেমিশে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি করল কিছুক্ষণের মধ্যে। এখন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, ওর গায়ের সঙ্গে যেন গা লেগে না যায় সে জন্য অদৃশ্য একটা দেয়ালের ব্যবস্থা রাখতে। ছেলেটাও ঘেমে গিয়ে খুব অস্বস্তিতে পড়েছে বলে মনে হলো। একবার আন্তরিকভাবে স্যরি বলল। স্যরি শোনার পর অন্য সহযাত্রীর মতো তার প্রতিও আমি কিছুটা প্রসন্ন হলাম। ইচ্ছা হলো, পকেট থেকে টিস্যু পেপার বের করে ওর হাতে দেই। তাতে সে কিছু মনে করতে পারে এবং পকেট হাতড়ানোর মতো যথেষ্ট জায়গা না থাকায় আইডিয়াটা বাদ দিলাম। যেভাবে আছি সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। এ রকম চিপার মধ্যে পকেট থেকে মানিব্যাগ আর মোবাইল খোয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই পেছনে তাকালাম। চারদিকে ভদ্রলোক। এদের মধ্যে কেউ পকেট মারার চিন্তা করবে না বলেই মনে হলো। তবু মাঝে মাঝে ত্বক দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছি, সব ঠিকঠাক আছে কি-না। মনে হচ্ছে, সবই ঠিকঠাক আছে।

বাস ফার্মগেট হয়ে বামে মোড় নিয়ে মহাখালী হয়ে গুলশানে ঢুকে যাবে। প্রতিদিনের মতো মহাখালীর লেভেল ক্রসিংয়ে একটা জ্যামের আশঙ্কা করছি। অন্তত জ্যাম কিছু থাকলেও যেন ট্রেনের জন্য ২৩ থেকে ৩৪ মিনিটের সিগন্যাল না পড়ে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা সত্ত্বেও রাওয়া ক্লাবের কাছে বাস থেমে গেলে ঘর্মাক্ত ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। কিছুই করার নেই। ওর হাসি ও অস্বস্তি দুইয়ের উত্তরে আমিও একটা শুকনো হাসি দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে জ্যাম ছাড়ার অপেক্ষা করার সময় আশপাশে তাকানোটা, মানে তাকাতে পারাটা বিশাল ব্যাপার। বাসের পাশে একটা পিকআপ দাঁড়ানো, সোয়ান ফোমের গাড়ি। গাড়ির গায়ে ফোমের তৈরি তুলতুলে নরম বিছানার ছবি। পাশে একটা মেয়ে বাঁকাভাবে দাঁড়িয়ে। পিকআপের পর একটা সিএনজি। একটা মেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে অন্যমনস্কভাবে বসে আছে। চোখে-মুখে কোনো অনুভূতি নেই। কোনো বাক্য নেই, মানে কোনো অভিব্যক্তি নেই। ফর্সা, একটু ফ্যাকাশে মুখ। হাত দুটো ভাঁজ করে বুকের নিচে বেঁধেছে। পাশে রাখা হ্যান্ডব্যাগ থেকে টিস্যু পেপার উঁকি দিচ্ছে। জ্যাম নিয়ে ওর কোনো উদ্বেগ আছে বলে মনে হলো না। একবার ভাবার চেষ্টা করলাম, মেয়েটা কী নিয়ে ভাবছে। বেশিদূর এগোনো গেল না। জীবনের জ্যাম নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে হয়তো, এই পর্যন্ত ভেবে থেমে গেলাম। রাওয়া ক্লাবের

নারিকেল গাছগুলোতে ক'টা ডাব ধরেছে তা প্রায় দিনের মতো গুনলাম। ফ্লাইওভারে গাড়িগুলো উঠে যাওয়ার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলাম। ভেতরে ভেতরে আমিও ঘেমেছি কিছুটা। পিঠ দিয়ে ঘামের একটা রেখা নিচে নেমে গেল অনুভব করলাম।

পাক্কা ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের জার্নি করে বাস থেকে নামতে আবার মারুফের ফোন।

বন্ধু, ফ্রি হইছো? নাকি এখনও বাসে?

আর বইলো না। মাত্র নামলাম। পুরা রাস্তা জ্যাম।

তাইলে বন্ধু আমি তোমারে আধাঘণ্টা পরে ফোন দেই।

না না সমস্যা নেই। বলো।

কেন তোমার অফিস কয়টায়?

এখন তো পুরা দশটা। দেরি হয়ে গেল না? শোনো তুমি এক কাজ করো অফিসে গিয়া একটু এসির নিচে বসো, ঠাণ্ডা হও। আমি তোমারে পরে ফোন দিতেছি।

মারুফ ফোন রেখে দেয়।

ওর ধৈর্য দেখে আমি একটু চিন্তায় পড়ে যাই। আমার ধারণা, মারুফের কোনো দরকার নেই আমার কাছে। সে জাস্ট বন্ধুর সামান্য খবর নিতে ফোন করেছে। সকালে ঘুম ভেঙেই হয়তো আমার কথা মনে পড়ে গেছে। জেলা শহরে থাকে, ব্যস্ততা নেই। সকালে নাশতা করে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাসার বারান্দায় বসে ফোন দিচ্ছে। আর বলছে, বন্ধু করো কী, ফোন ধরো না কেন? বউকে বলছে, তামান্না দেখলা। শুভ তো আমারে পুরা ভুইলা গেছে। ফোন পর্যন্ত ধরে না। দাঁড়াও আরেকবার রিং দেই। হয়তো তামান্না কিছু বলে না। শুধু হাসে। আর মারুফ মনের সুখে আমাকে রিং দিতে থাকে। ১১টা-১২টার দিকে দোকানে যাবে। তার আগে আজকে হয়তো তার সময়ই কাটছে না।

অফিসে ঢুকে, পিসি অন করে এক কাপ দুধ চা আর দুটো পরাটা আনতে বলে আমি মারুফকে কল করি। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে, তাই ব্রেড গরম করার সময়টুকুও পাইনি। নাশতা না করেই বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছি। পিয়ন পরোটা নিয়ে এলে চা'র মধ্যে পরোটা ভিজিয়ে খাব। দুধ চায়ে পরোটা ভিজিয়ে খেতে খারাপ না। অপরিচিত খাবারের টেস্ট পাওয়া যায়। ফোন ধরেই মারুফ বলে বন্ধু,

তুমি করলা কেন? আমি তো করতামই একটু পর।

না না। সমস্যা নেই।

তুমি বলো। তুমি কেমন আছো, সেইটা বলো।

ভালো আছি বন্ধু। তুমি কেমন? তোমারে তো পাই না।

আর বইলো না, সংসার ব্যবসাপাতি নিয়া মহাব্যস্ত আছি। ফোন না দিলে পাবা কেমনে?

সেটাই। ফোন দিতে চাই। মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে হয়। কিন্তু বুঝো তো, দেখলা তো আজকে। ঢাকা শহরে দিনের অর্ধেক রাস্তায় কেটে যায়। ফোন দিবো যে, সময় পাই না। জীবন থেকে আড্ডাউড্ডাও উড়ে গেছে।

আচ্ছা শোনো, তামান্না তো তোমার কথা বলে। একবার আসো, যশোর ঘুরে যাও।

কেমন আছে তামান্না?

ভালো। ওরে দিবো নে। কথা বলবে তোমার সঙ্গে। আচ্ছা শোনো জামান, রাশেদ, আশিক এদের সঙ্গে তোমার দেখা হয় না?

মারুফ, জামান, আশিক, আমি খুব কাছের বন্ধু ছিলাম স্কুলে। জামান মতিঝিলের একটা ব্যাংকে আর আশিক অ্যাডফার্মে কাজ করে। সত্যি কথা বলতে এদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তবু মারুফকে আশ্বস্ত করার জন্য বলি–

হয়, হবে না কেন। ওইদিন আশিকের সঙ্গে ফেসবুকে দেখা হইলো। কত কথা। আশিক বলে বন্ধু, ফেসবুক না থাকলে তো এই দফা তোমারে আর খুঁজে পাইতাম না।

মারুফ বুঝতে একটু সময় নেয়। বলে, ইন্টারনেট তো আমি বুঝি না। শিখতে হবে। তামান্নারও খুব ইচ্ছা। আচ্ছা বলো তো, ফেসবুকে কি ভিডিও দেখা যায়?

না। কেন কইলা এইটা?

তুমি না কইলা ফেসবুকে আশিকের সঙ্গে দেখা হইলো।

দেখা তো আর দেখা না। ওরে অনলাইনে পাইছিলাম। চ্যাট হইলো। ভালোমন্দ আলাপ-আলোচনা হইলো।

তার মানে তো দেখা হয় নাই। তুমি দেখতে কেমন হইছো, আশিক দেখতে কেমন হইছে এইটা তোমরা দেখো নাই। হাত মিলাও নাই। বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করো নাই। একসঙ্গে বইসা চা খাও নাই। খিস্তিখেউর করো নাই। তাই না?

হ।

তাইলে এইটারে কি দেখা হওয়া বলে। বলো?

মারুফ, এখনকার দেখা এইরকমই। ফেসবুকে কত কিছু হয় তুমি জানো? প্রেম-ভালোবাসা সবই হইতেছে এখন।

বুঝছি, তোমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেছো। এক কাজ করো, ফেসবুকে ভালো দেইখা একটা মেয়ে পছন্দ কইরা বিয়া করে ফেল।

হাতে ধরবা না। চুমা খাবা না। বিছানায় শুবা না। মনে মনে বিয়া কইরা ফেলো। জানো তো মনে হয়, বিদেশ থেকে এখন বাঙালি ছেলে-মেয়েরা ফোনে বিয়া করে। দেখা নাই, সাক্ষাৎ নাই বিয়া হয়ে যায়।

কী যে কও না তুমি।

কী কই? আচ্ছা শোনো বন্ধু, তুমি ভালো থাইকো। তোমার সময় নষ্ট করতেছি। সকালে উঠে তোমার কথা মনে হইলো। কথা বলার খুব ইচ্ছা করতেছিল। রাশেদ জামান আশিক তুমি আমি মিলে যদি আবার একসঙ্গে মিলতে পারতাম।

তুমি তো ঢাকা আসো না। আসো একবার।

ঢাকা তো যাই। ব্যবসার কাজে প্রতি মাসে যাওয়া লাগে।

কই একবারও তো ফোন দেও না। দেখাও তো করো না।

এইবার আসবো। আসার আগে তোমারে ফোন দিবো। একসঙ্গে একটা হেভি আড্ডা দিবো। তুমি জামান আর আশিকরে বইলা রাইখো। আগে থেকে বলে রাখলাম খানাপিনার স্পন্সর আমি। মনে করবা, যশোরে তোমরা আসলে আমি যে পার্টি দিতাম, সেইটা ঢাকায় দিতেছি।

কনফার্ম?

কনফার্ম। মারুফ ফোন রাখলে আমি কাজে বসে পড়ি।

আজ রবিবার। বলতে গেলে আজ আমার ছুটি। বায়ারদের দেশে অফিস বন্ধ। মেইল চালাচালির ঝামেলা নেই। অর্ডার নেয়া, ডিজাইন বুঝে নিয়ে কোয়ালিটি কন্ট্রোলে দশবার ছোটাছুটির হ্যাপা নেই। বৃহস্পতিবার লাস্ট শিপমেন্ট গেছে। নতুন অর্ডার আসতে আসতে দু'তিন দিন লাগতে পারে। এর মধ্যে বায়ারদের সঙ্গে রুটিন মেইল চালাচালি ছাড়া বিশেষ কোনো দায়িত্ব নেই। মেইল বক্স এখনও ফাঁকা। পুরনো বায়িং হাউস বলে বায়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো। নতুন অর্ডারের জন্য অনলাইনে ছোটাছুটির বালাই নেই। শুধু পুরনো বায়ারদের ধরে রাখার জন্য যতটুকু আন্তরিকতা, সিরিয়াসনেস আর সময় মানা দরকার ততটুকু মানলেই চলে।

ফেসবুকের ফিডগুলো বাদ দিলে পার্সোনাল মেইল খালি। ফেসবুকের ফিড ১৭টা। আগে মাঝে মাঝে মনে হতো, সেটিংসে গিয়ে মেইল বক্সে ফিড আসা বন্ধ করে দেই। কী মনে করে আর বন্ধ করিনি। মেইল বক্সটা ভরা দেখতে ভালো লাগে। ফেসবুকের ফিডগুলোতে একবার নজর বোলালে ফেসবুক না খুলেও খবর সব পাওয়া যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ফেসবুকের মেসেজগুলো আলাদা ফোল্ডার করে জমিয়ে রাখি আমি। নিউজফিডগুলোকে সিলেক্ট করে ফোল্ডারে চালান করে ফেসবুক ওপেন করি।

৫ ফ্রেন্ড সাজেশন, ৩টা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, ৭ আদার রিকোয়েস্ট, ২টা পার্সোনাল মেসেজ।

ফেসবুকে ঢুকে আমার প্রথম কাজ হরোস্কোপ দেখে নেয়া। আমি তুলারাশির জাতক। আজ আমার এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা আমার আগামী সপ্তাহের কর্মকাণ্ডের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে। কী সেটা ভাবতে ভাবতে নতুন স্টেটাস লেখার জন্য প্রস্তুত হই। কী ভাবছি এখন, কী করছি তা জানানোর মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে। স্টেটাস-ম্যানিয়া। যেদিন ফেসবুকে একদম বসাই হয় না সেদিন শুধু স্টেটাস দিয়ে চলে যাই। দিনের শুরুতে স্টেটাস বদলে দিতে পারলে নিজেকে অ্যাকটিভ লাগে। কানেকটেড ফিলিংটা আসে। কখনো মোবাইল থেকে লগইন হয়ে স্টেটাস দেই। স্টেটাস শেয়ার করার জন্য নাকি টুইটার ভালো। কিন্তু টুইটারে শুধুই স্টেটাস, কেমন খালি খালি লাগে। বরং ফেসবুক প্রোফাইল কমপ্লিট একটা অনুভূতি তৈরি করে।

আজ কী লিখব? টেবিলে আঙ্গুল চালিয়ে কিছুক্ষণ টোকা দিতেই মনে এলো আইডিয়াটা।

‘ভিড়ের বাসে ঘর্মাক্ত একজন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলো। মনটা ভালো হয়ে গেল।’

পাবলিশ করার সঙ্গে সঙ্গে মুন্না লাইক দিলো স্টেটাসে। আমি স্টেটাস দিলে আর মুন্না অলনাইনে থাকলে এটা ঘটবেই। জীবন সাহা লাইক দেয়ার পর একটা কমেন্ট করল, আমি নিজে ঘামি কিন্তু ঘর্মাক্ত মানুষের স্পর্শ ভালো লাগে না।

মুন্না মোবাইল থেকে ফেসবুকে ঢুকেছে। ওর প্রোফাইলে গিয়ে জানা গেল বেচারা জ্যামে আটকে আছে। ‘লাইফটারে আর ভালা পাই না। দুইটা ক্লাস শেষ, কলেজের কাছে পৌছাইতে পারলাম না।’

আমি কমেন্ট করলাম, কই আটকা পড়লা?

কিছুক্ষণ পর মুন্নার উত্তর,

পুরানা পল্টনের বিখ্যাত জ্যামে।

তিন্নি আমার ওয়ালে একটা নোট শেয়ার করেছে। আমাদের ইউনিভার্সিটির বন্ধু রাশেদ ক্লাসমেটদের নিয়ে মজার কিছু কমেন্ট করেছে। ক্যাম্পাসে কে কেমন ছিল, এখন কে কেমন হয়েছে এসব জানিয়ে। বন্ধুরা সমানে কমেন্ট করেছে। আমিও লাইক দিলাম।

একবার তিন্নির প্রোফাইল ঘুরে এলাম, ওর জীবনে নতুন কিছু ঘটল কি-না একটু পরখ করে দেখার জন্য। না নতুন কিছু ঘটেনি। অথবা প্রোফাইলে একবার নজর বুলিয়ে বোঝা গেল না।

প্রথম প্রথম ফেসবুকে যখন চ্যাট অপশন ছিল না তখন ফেসবুক অন্যরকম ছিল। আমি চ্যাটের খুব ভক্ত নই। বায়ারদের সঙ্গে চ্যাট করতে করতে বা স্কাইপিতে আলাপ চালাতে চালাতে কেউ ইয়াহু বা জিমেইলে চ্যাটের জন্য নক করলে মনে হতো শুরু হলো আবার অফিসের কাজ। ওয়েবক্যাম নিয়ে টানাহেঁচড়াও ভালো লাগে না। কিন্তু ফেসবুকে চ্যাট শুরু হওয়ার পর একটু অন্যরকম ফিল হলো। এখানে চ্যাট করার ব্যাপারটা এনজয় করলাম। এখানে সাধারণত অনলাইন মোডে থাকি। কেউ টুক করে কোনো কথা বলে উঠলে, স্টেটাস নিয়ে কথা বলে উঠলে ভালো লাগে। আমিও কাউকে কাউকে কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই নক করে বসি। ফেসবুকে চ্যাটের মজাই এমন যে, সব কাজ করতে করতে তৃতীয় একটা চোখ কম্পিউটারের মনিটরের ডানকোনায় থেকে যায়। চ্যাটবক্সে ক্লিক করে দেখলাম কে কে অনলাইনে আছে। ১২ জন অনলাইনে। ৩ জন অ্যাকটিভ, বাকিরা আইডেল। যারা আছে আপাতত তাদের কারো সঙ্গে কথা জমার সম্ভাবনা নেই। ইনবক্সে দুটো মেসেজ। দুটোই গ্রুপের ফিড। সাধারণত কোনো কাজের জিনিস হয় না। তবু অভ্যাসবশত মেসেজ চেক করতে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই নাজিয়া নক করে। প্রথমে নাজিয়ার নাম দেখে অবাক হলাম। কোনো অপরিচিত মেয়ে সাধারণত যেচে থেকে নক করে না। কেউ নক করলে ধীরে সাবধানে জবাব দেয়। কিন্তু নাজিয়ার মেসেজের বাক্যটা পড়ে একটু চমকে উঠলাম। আজকে তাহলে সূর্য কোনদিকে উঠল?

আর ইউ ফ্রি, শুভ?

ইয়েস, হোয়াট টু ডু?

জাস্ট স্টে উইথ মি সামটাইমস।

আপনার কী হয়েছে। আমাকে বলেন।

ডোন্ট সে এনি ওয়ার্ড প্লিজ, জাস্ট স্টে অনলাইন উইথ মি।

এসব ক্ষেত্রে সবাই যা করে আমিও তাই করলাম। চট করে নাজিয়ার প্রোফাইলে গিয়ে তার ইনফো দেখলাম। ব্যক্তিগত তথ্য দেখলাম। স্টেটসে থাকে। সম্ভবত পড়াশোনা করে। মাসখানেক আগে আমাকে ফ্রেন্ডলিস্টে অ্যাড করেছে। মনে পড়ছে ঠিকঠাক। ওর অ্যালবাম দেখে মনে পড়ল নাজিয়ার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর ওর প্রোফাইলে গিয়েছিলাম একবার। কিছুটা সুন্দর কিছুটা বিষণ্ন, মনমরা চেহারা। নিউইয়র্কের রাস্তায় উইন্টারে ঘুরে ঘুরে অনেক ছবি তুলে একটা অ্যালবাম বানিয়েছে। শীতের ভারী কাপড় পরনে। গোল, শান্ত, ফর্সা বাঙালি মুখ। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু নেই চেহারায়।

অ্যাড করার পর একবার প্রোফাইল দেখা পর্যন্তই সম্পর্ক। এরপর আর যোগাযোগ হয়নি। কোনো মেইল বিনিময় হয়নি। মাঝে মাঝে দেখেছি নাজিয়া অনলাইনে আছে, কখনো অ্যাকটিভ, কখনো আইডেল মোডে। নক করিনি। অপরিচিত অনেক মানুষ। এমন না যে অপরিচিতদের সঙ্গে হঠাৎ কথা হয় না। এমন না যে বলার কথা সামান্য। কিন্তু নাজিয়ার সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু সে হঠাৎ স্টে উইথ মি বলবে কেন? পূর্বপরিচিত না তো? হতে পারে, তাকে ডাক নামেই চিনি, নাজিয়া নামটা হয়তো পরিচিত হয়ে ওঠেনি কোনো কারণে। স্মৃতি থেকে নাজিয়া নামটা কিছু অনুষঙ্গসহ রিকল করার চেষ্টা করলাম। নাহ, নাজিয়া নামে কোনো পূর্বপরিচিতের কথা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। কমন ফ্রেন্ডদের লিস্ট দেখলাম। অনেক চেষ্টা করেও ওর সঙ্গে যোগাযোগের লিঙ্কটা বুঝতে পারলাম না।

স্টে উইথ মি মানে কী? নাজিয়ার এই মুহূর্তের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি। যদি সে স্টেটসে থাকে তবে এখন সেখানে গভীর রাত। একটা তো হবেই। হয়তো মেয়েটা খুব কষ্টে আছে। হু হু করে কাঁদছে। কোনো অঘটনের মধ্যে পড়তে পারে। অনেক চেষ্টা করে ঘুমাতে ব্যর্থ হয়ে আমাকে নক করে বসেছে। এতক্ষণ হয়তো কেঁদে কেটে বিছানা ভাসিয়ে দিয়েছে, এখন ফ্ল্যাট বাড়ির একলা রাতে ফেসবুক খুলে বসা ছাড়া আর কোনো উদ্যোগের কথা সহসা তার মনে হয়নি। ফলে সে কিছুক্ষণ দেশের মানুষের প্রোফাইলে প্রোফাইলে ঘুরছে। অনেক সময় ধরে ভেবে, অথবা হঠাৎ করে আমাকে দেখেই হয়তো নক করে বসেছে। ভাবছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগবে। কিছুটা হালকা বোধ করতে পারে। মন খারাপের মধ্যে কম্পিউটার খুলে ফেসবুকে বসার কথা যে তার মনে হয়েছে তাতে সমস্যাটার প্রকার সম্পর্কে আমি অনুমান করতে চেষ্টা করি। নাজিয়ার অ্যালবামে চোখ বোলাতে বোলাতে আমি কথা শোনার অপেক্ষায় বসে থাকলাম।

অনেকক্ষণ বোকার মতো ফেসবুকে পায়চারি করতে করতে নাজিয়ার স্টে উইথ মি কথাটার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করলাম। কথা শুনছি না, মুখ দেখছি না, টেক্সট লিখে লিখে ফেসবুকের ৪ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি চ্যাটরুমে কথা হচ্ছে। এখানে সঙ্গে থাকার প্রক্রিয়াটা কতটা কার্যকর হতে পারে তা নিয়ে আমি কিছুটা কনফিউজড। সঙ্গে থাকা মানে তো শুধু অনলাইনে থাকা। আমি অনলাইনে আছি, এর স্বাক্ষর হিসেবে আমার অ্যাকটিভ থাকার চিহ্ন– একটা সবুজ বাটন জ্বলে আছে আমার প্রোফাইল পিকচারের পাশে। আর কিছু করার নেই।

এর চেয়ে বরং কথা চলতে পারত। নাজিয়া বলুক তার সমস্যা কী? এভাবে হঠাৎ স্টে উইথ মি বললে বুঝতে পারি কোনো একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে হয়তো সে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন, সে কি কাঁদছে না জাস্ট মন ভার করে বসে আছে সে সম্পর্কে আমি স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে পারি না। তার কোনো আত্মীয়স্বজন মারা গেছে কি-না, আমি জানি না। কোনো কারণ ছাড়াই তার খুব একা লাগছে কি-না আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে, নাজিয়াকে আমি তেমন করে চিনিও না। অর্থাৎ একজন মানুষকে চেনা বলার জন্য তার যতটুকু তথ্য জানা থাকা দরকার আমার কাছে তা নেই।

হঠাৎ করে এমন অপরিচিত একজন মানুষ এসে যখন বলে, স্টে উইথ মি, তখন খুব অসহায় লাগে। কিছু করার নেই, তবু সঙ্গে থাকতে হবে। আমার মনে হলো, নাজিয়ার হয়তো পরিবারের কোনো সদস্য মারা গেছে। কাছের কোনো বন্ধুর আত্মীয়স্বজন মারা গেলে আমরা কী করি? হয়তো তাকে ফোন দিয়ে বসে আছি, মুখে কোনো কথা আসছে না। কী বললে সে সান্ত্বনা পাবে, জানি না। শুধু ফোন করে বোকার মতো চুপ করে আছি। শেষে সে-ই হয়তো নীরবতা ভাঙল। বলল, পরশু কুলখানি আছে, চলে আসিস। হয়তো বলল, বাবা তো কারোরই চিরদিন বেঁচে থাকে না। কিন্তু একটা ব্যাপার কি জানিস। বাবা হারানোর অনুভূতিটা একদম আলাদা। এটা কোনোভাবে এক কথায় বোঝানো যাবে না, দোস্ত।

নীরবতার একটা সান্ত্বনা থাকে। ভাষা হারিয়ে গেলে সেই নীরবতাকেই অবলম্বন করে লোকে। আমিও অনেকক্ষণ নীরব থাকলাম।

একবার মনে হলো– স্টে উইথ মি, কথাটার অনেক গভীরতা। আমি জানি না সে কী মিন করেছে। আমি সিওর না নাজিয়া বড় কোনো বিপদে পড়েছে কি-না। এমন তো হতে পারে সে সুইসাইড করতে যাচ্ছে। সুইসাইড করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে একজন লোকের পক্ষে ল্যাপটপ খুলে বসে ফেসবুকে লগ ইন করে অপরিচিত এক বন্ধুকে সঙ্গে থাকার কথা বলা সম্ভব? এ রকম সময় মানুষের ভাবনা-চিন্তা কেমন হয় সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কী করব বুঝতে পারছি না। ডেস্কে বসে আছি। এক কাপ চা দরকার। এভাবেই বসে থাকব নাকি চা খাবার জন্য উঠব– এ চিন্তা মাথায় নিয়ে টেক্সট লিখতে থাকলাম চ্যাটবক্সে।

নাজিয়া, আর ইউ দেয়ার?

নীরবতা।

হু।

আপনার মন খারাপ কেন? আপনি কি আমাকে বলবেন? আমি কারো সঙ্গেই শেয়ার করব না। প্লিজ, টেল মি হোয়াট হ্যাপেনড টু ইউ।

নীরবতা।

আপনি কি স্টেটসে থাকেন?

হু।

আপনি কি পড়াশোনা করেন?

নীরবতা।

পোস্ট গ্রাজুয়েশন?

নো।

আপনি কি একা থাকেন?

হু।

বাসার সঙ্গে যোগাযোগ হয়?

হু।

বাসায় সবাই ভালো আছে?

নীরবতা।

এর মধ্যে ফোনে কথা হয়েছে?

হু।

নাজিয়া, হু ছাড়া কিছু বলবেন না?

হু।

নীরবতা।

আইহ্যাভ নো ওয়ার্ড দ্যাট ক্যান এক্সপ্লেইন মাই স্টেটাস টু ইউ শর্টলি।

দেন ট্রাই সাম ওয়ার্ডস। মে বি দে ক্যান হেল্প মি টু স্টে উইথ ইউ। অ্যাট লিস্ট আই নিড সাম ইমেজ। আপনি জানেন, শব্দ ছাড়া যোগাযোগ কত কঠিন? আপনি কথা বলুন। অ্যাট লিস্ট আপনি যে ঘরে আছেন সে ঘরের কথাই কিছু বলেন।

নাজিয়া কথা বলতে শুরু করল।

আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কি-না জানি না। এভাবে কাউকে কোনো দিন পাশে থাকতে বলিনি আমি। আপনাকে কেন বললাম জানি না। আপনাকে প্রায়ই দেখতাম অনলাইনে। প্রতিদিন স্টেটাস দেন। মজার কথা লেখেন, তাই না? ওই স্টেটাসগুলো পড়ে পড়ে আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছিল। অনেকে অযথা নক করে, কথা বলতে চায়। জানেন তো? আপনি কখনোই নক করেননি। আপনাকে অনেক রেসপন্সিবল মনে হয়। সম্ভবত আপনার কাজের সঙ্গে অনলাইনে থাকার একটা সম্পর্ক আছে। তাই না? কারণ আপনি উইকডেইজগুলোতে রেগুলার থাকেন। উইকএন্ডে আপনাকে পাওয়া যায় না। অনলাইনে দেখতে দেখতে আপনার সম্পর্কে কিছু কথা হয়তো আপনা থেকেই ভেবেছি। আজকে আমার খুব কষ্টের একটা দিন। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানোর পর আবিস্কার করলাম, আমি আসলে ঘুমাইনি, আমি শুধু ভাবছি। জেগে আছি। একটা ভাবনা থেকে

বের হতে পারছি না। খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। ঘুম আসছে না দেখে উঠে বসলাম। ভাবনাটা আমার সঙ্গে উঠে বসল। বুঝতে পারলাম, ভাবনাটাকে ডাইভার্ট করে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। ঘুমানো তো পরের কথা, এখন স্থির হয়ে বসে থাকার জন্য হলেও অন্য চিন্তা করা দরকার। কারো সঙ্গে কথা বললে হয়তো ভাবনাটা অন্যদিকে চলে যাবে ভাবলাম। কার সঙ্গে কথা বলব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ ফেসবুক খুলে দেখি আপনি আছেন। মনে হলো, আপনাকে বলি। আমি নিশ্চিত ছিলাম আপনি মন দিয়ে আমার কথা শুনবেন। আপনাকে দেখে অমনই মনে হয়েছিল। আর সত্যি সত্যি সেটা ঘটল। মানুষকে আমি ভালো পাঠ করতে পারি। আপনি কোনো আপত্তি না করে আমার সঙ্গে থাকলেন। কথা বলার আগে আপনার সম্পর্কে এমনই ধারণা হয়েছিল। আই'ম গ্রেটফুল টু ইউ।

কিন্তু নাজিয়া আমি তো আপনার কোনো উপকারই করতে পারলাম না। ইন ফ্যাক্ট আমি জানিও না, আপনার সমস্যাটা কী? আমাকে বলা যাবে?

আমার কথার ভঙ্গিতে নাজিয়া আশবস্ত হতে থাকে। ধীরে ধীরে তার কথা বলতে থাকে। একটু একটু করে। আমি মন দিয়ে তার কথা শুনতে থাকি।

প্রবাসিনি, তুমি আজ এমন দরিদ্র এক প্রবাসে এসেছ!

কোথাও পড়েছিলাম বা কোনোভাবে শুনেছি, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় নাকি ঐতিহাসিক স্থান দেখার মতো অনুভূতি তৈরি করে। নাজিয়ার কথা শুনতে শুনতে তেমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল। একেকটা মানুষ যেন একেকটা জনপদ। কত ঘটনা যে তাকে কেন্দ্র করে ঘটে। এককথায় বোঝার উপায় নেই। পরিচয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ একেকটা ইতিহাস বলতে থাকে। অন্য আরেকজন পরিচিত হতে হতে সেই ইতিহাসের ভেতর পরিভ্রমণ করতে থাকে। নাজিয়ার কথা শুনতে শুনতে টুকটাক দু'একটা কাজ সারি। নতুন বায়ারের সন্ধানে একটা সার্চ দেই গুগলে। খুব দরকারি কাজ নয়, আমার অ্যাসাইনমেন্টও নয়, তবু অফিসের সময়টা হালাল করার একটা ব্যাপার আছে। বস ডেকে পাঠালে বলার মতো একটা কথা থাকতে হবে। একটা বিজি বায়িং হাউসের মার্চেন্ডাইজারের কোনো কাজ নেই এটা অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু সত্য হলো আজ কোনো কাজই নেই। কাজের চাপ থাকলেও অবশ্য সমস্যা হয় না। নেটে বসতে বসতে আমি নেট ব্যবহারে অনেকটা দক্ষ হয়ে উঠেছি। বিদেশি সিনেমায় কিছু চরিত্র থাকে, যারা কানে ফোন লাগিয়ে হড়হড় করে কথা বলে যায় আর এখান থেকে ওখানে ঘুরে ঘুরে এটা-সেটা অনেক কাজ করতে থাকে। আমার অবস্থা কিছুটা এ রকমই। কারো সঙ্গে চ্যাটবক্সে আলাপ চলছে হয়তো। এই ফাঁকে আমি নতুন ক্লায়েন্টের সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছি স্কাইপিতে। পুরনো ক্লায়েন্টের অর্ডার নিচ্ছি। অর্ডার প্রিন্ট করে বসের রুমে দিয়ে আসছি। বসের পক্ষ থেকে মেইল লিখে বায়ারকে পাঠিয়ে দিয়ে বসকে একটা সিসি পাঠাচ্ছি। শিপমেন্ট ঠিকঠাক পৌঁছল কি-না খবর নিচ্ছি। ক্লায়েন্টের অভিযোগগুলো নোট করছি। বায়িং হাউসে যা হয়। আমাদের হাউস পুরনো। অলরেডি একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে চলে গেছে কোম্পানি। কাজ পেতে সমস্যা নেই। তবু মার্কেট বলে একটা কথা আছে। বস বলে, নতুন বায়ার আনো। নইলে হাউস টিকবে না। তাই মাঝে মাঝে নতুন ক্লায়েন্ট খোঁজা হয়। কোনো অর্ডার পেলে ক্লায়েন্টের চাহিদা বোঝার জন্য স্যাম্পল নিয়ে জোরদার মিটিং ডাকা হয়। ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট বোঝার চেষ্টা চলে। কোথায় ভালো কাজ হবে তা নিয়ে এনালাইসিস চলে। আর কখনো শিপমেন্টে দেরি হলে, বায়ারের কোনো অভিযোগ এলে বস ঘুম হারাম করে দেয়। দিন নেই, রাত নেই কখনো কখনো সাভার আশুলিয়া মিরপুর দৌড়াতে দৌড়াতে রাত পর্যন্ত কাবার হয়ে যায়। শিপমেন্টের দিনগুলোতে এই ব্যস্ততা ছোটাছুটি ছাড়া আমার মূল কাজ, বিয়িং অনলাইন। বস বলে, ইমিডিয়েট রেসপন্স ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। ঘুমাতে যাওয়ার আগে একবার মেইলবক্স চেক করবে।

কখনো সারাদিন অলসভাবে বসে থাকি। লিভিং অনলাইন।

কখনো খুব অসহ্য লাগে।

জীবন একদিন জিমেইলে এসে বলেছিল, শুভ আপনার কিন্তু সতর্ক হওয়া দরকার। দিনে অ্যাটলিস্ট ৮ ঘণ্টা অনলাইনে থাকেন না? শোনেন, এক কাজ করবেন, মাঝে মাঝে চোখ কচলাবেন। এমনিতে আমাদের চোখ সেকেন্ডে ত্রিশবার আপ-ডাউন করে। কিন্তু কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে চোখের পাতা বন্ধ হতে পারে না। তখন চোখের মণিতে রস আসতে পারে না। চোখ শুকিয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। আপনি কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে চোখ খোলা-বন্ধ করবেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চোখে পানি দেবেন। আর প্রচুর পানি খাবেন। আর শোনেন, মেরুদণ্ড সোজা করে বসার অভ্যাস করেন। পারলে মাঝে মাঝে হেঁটে আসবেন। এ ডেস্ক সে ডেস্ক ঘুরবেন।

একদিন হয়তো কম্পিউটারে বসে কাজ করতে করতে আমার স্পন্ডলাইসিস হয়ে যাবে। ট্রাকশন দিয়ে আর যোগ ব্যায়াম করতে করতে বাকি জীবনটা চলে যাবে। বালিশ ছাড়া শক্ত বিছানায় ঘুমাতে হবে। শক্ত বিছানার কথা মনে পড়লেই সিনা টান হয়ে যায়। আপনা হতেই মেরুদণ্ড নিজেই সতর্ক হয়ে পড়ে। একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। এভাবে হাঁটাহাঁটি করতে থাকলে বস মনে করে কাজ নেই। শুভ, আজ কি মেইল কম নাকি? সব মেইলের উত্তর দিয়েছো তো? সন্দেহ তার চোখে-মুখে। আমি তাকে আশবস্ত করে আবার নিজের কিউবিকলে ফিরে আসি। আসার সময় অযথাই বলি, শ্রাবণ মাস চলে গেল, বর্ষা তো এলো না, স্যার। গভীর উদ্বেগ নিয়ে এ কথা বলে আমি মুখ ভার করে চলে আসি। বস আমার কথার ভঙ্গিতে অবাক হয়ে যায়। হয়তো সহসাই তার চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। ইউএসএতে নতুন অর্ডারের তদবির করার জন্য একটা মেইলের নির্দেশনা দিতে তিনি কিছুক্ষণের জন্য হয়তো ভুলে যান।

কিউবিকলে ফিরে আমি ফেসবুক খুলে বসে থাকি।

মাঝে মাঝে সারাটা দুপুর চলে যায়, কথা বলার মতো কাউকেই পাওয়া যায় না। তখন অপরিচিত লোকজনকে অ্যাড করতে থাকি। ফ্রেন্ডলিস্টে এমন অনেক লোকের আগমন ঘটে, যাদের আমি চিনি না। তারাও আমাকে চেনে না। পার্সোনাল ইনফরমেশন কম-বেশি দেয়া থাকে ইনফোতে। তবু তাদের জিজ্ঞেস করি, হাই, আর ইউ ফ্রম ঢাকা? নাইস টু মি ইউ হিয়ার অন ফেসবুক। সি ইউ। এ রকম ফালতু আলাপ করে, কোনো প্রোফাইলে কারো অ্যালবাম দেখে তার জীবনধারা সম্পর্কে অনুমান করতে করতে এক ফাঁকে ক্যান্টিনে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে আসি।

আজ নাজিয়া ব্যস্ত রেখেছে। ভালো লাগছে। ওর কথা শুনতে শুনতে দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু ভদ্রতাবশত বলতে পারছি না।

আপনার ওখানে ক'টা এখন?

রাত তিনটা।

ঘুমাবেন না?

আপনার কি আমার কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না, আপনি কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?

চার ঘণ্টার আলাপের পর এ রকম কথা শুনলে একটু বিরক্ত লাগে। তবু নাজিয়া খুব সমস্যায় আছে ভেবে আমি প্রকৃত কারণটা বললাম।

আমি লাঞ্চ করে এসে কি আপনাকে পাব?

কতক্ষণ?

২০ মিনিট।

২০ মিনিটের ছুটি নিয়ে আমি লাঞ্চে যাই। নাজিয়া বলে, এই ফাঁকে সে এক মগ কফি বানাবে। কফি খেলে আমার ঘুম আসে না। জানি না নাজিয়ার কী হয়। গরম কফি খেয়ে কেউ কেউ নাকি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষ কফি খায় ঘুম তাড়ানোর জন্য। হয়তো আজ রাতে আর ঘুমাবে না সে। হয়তো কাজ নেই কাল। ছুটি নিয়েছে। ভালো স্কলারশিপ নিয়ে স্টেটসে গেছে। অডজব করতে হয় না, কাজের চিন্তা করতে হয় না সম্ভবত। নাজিয়া সম্পর্কে কিছু রূপকথা সাজানোর চেষ্টা করি আমি। কিন্তু সমস্যা হলো এত কথার পরও নাজিয়ার সমস্যার কথা চার ঘণ্টাতেও জানতে পারা গেল না। ইন ফ্যাক্ট, বুঝতে পারা গেল না।

লাঞ্চ শেষ করে এসে দেখি, যথারীতি অনলাইনে অ্যাকটিভ মোডে বসে আছে নাজিয়া। আমাকে অ্যাকটিভ হতে দেখেই টেক্সট পাঠালো।

কী খেলেন?

গরুর মাংস, সবজি আর ডাল।

আপনার কফি শেষ?

না এখনও শেষ হয়নি। ডু ইউ ওয়ান্ট এ কাপ?

সে কী করে সম্ভব? আপনি কতদূরে। কফি খাওয়াবেন কেমন করে?

খেতে জানলেই হয়। দাঁড়ান আপনার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আসি।

একটু সময় যায়। নাজিয়া আমার জন্য এককাপ কফি নিয়ে আসে।

বলে এই নিন।

একটা চড়ুইভাতি খেলার মতো। মিছেমিছি রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার অভিনয় করা।

বাহ খুব সুন্দর কফি বানান তো আপনি। খুব ভালো হয়েছে। নরমালি আমি কিন্তু এত চিনি খাই না। এরপর যেন মনে থাকে। বড় কাপে এক চামচ চিনি।

নাজিয়া হাসে, বলে, ওকে স্যার। মনে থাকবে।

ভার্চুয়াল কফি খেতে খেতে আলাপ করতে থাকি।

নাজিয়া তার সমস্যার কথা সবিস্তারে বলতে থাকে। বলা যায়, বলার জন্য উস্কে দিলে নাজিয়া তাতে সাড়া দেয়। উস্কে দেয়ার জন্য একটা সূত্র খুঁজে পেয়ে সেখানেই কামান দাগাই। রিলেশনশিপ স্টেটাসে নাজিয়া লিখে রেখেছে, ইটস কমপ্লিকেটেড। সাধারণত যারা রিলেশন নিয়ে কনফিউজড থাকে তারা এ ধরনের স্টেটাস লিখে রাখে।

আপনি কি বিবাহিত?

হ্যাঁ এবং না দুটোই। ইন ফ্যাক্ট আওয়ার রিলেশন ইজ নট ওয়ার্কিং এনিমোর।

বিয়ে করেছিল নাজিয়া। বিয়ে অবশ্য নিজে থেকে করতে চায়নি। মাস্টার্স শেষ করার পর বাইরে পড়াশোনার জন্য অ্যাপ্লাই করছিল। মেডিকেল অ্যানথ্রোপলজিতে এমএস করার জন্য একটা বৃত্তিও পেয়ে গিয়েছিল স্টেটসে। ভেবেছিল, এবার বিয়ের চাপটা কমে আসবে। অন্তত স্টেটস থেকে ফেরার আগে আর কথা উঠবে না। কিন্তু এর মধ্যেই পাত্রের খোঁজ পাওয়া গেল। স্টেটসেই থাকে। দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল। বিয়েও হলো, পড়াশোনাও চলল। এক ঢিলে দুই পাখি মারার কথাই মাথায় এসেছিল তখন। খুব তাড়াহুড়ো করে আয়োজন। স্কলারশিপ আগেই পাকা হয়ে ছিল। পড়াশোনা ও বিয়ে দুই পাখি মারার জন্য তাকে দ্রুত স্টেটসে শিফট করতে হলো। জ্যাকসন হাইটসে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই হলো। সবকিছু ভালোমতোই চলছিল। এ সুইট হ্যাপি কাপল।

দেন সাডেনলি ইন আ ব্যাড মর্নিং নাজিয়া ডিসকভারড দ্যাট হার হাজব্যান্ড ওয়াজ ইনভলভড উইথ সামওয়ান এলস। হু ইজ রিলেটেড টু হিম। কাজিন সিস্টার। জ্যাকসন হাইটসের পরের স্ট্রিটে থাকা এক বিবাহিত কাজিন সিস্টারের সঙ্গে নাজিয়ার হাজব্যান্ডের এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশন চলছে। হয়তো বিয়ের আগে থেকেই চলছিল। কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন এসব খেয়াল করার সুযোগ পায়নি। নাজিয়া বলে, এখানকার পড়াশোনার ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের দেশের মতো অত রিল্যাক্সড নয়, জানেন তো। পড়া মানে পড়াই। প্রতিদিন আপনাকে কাজ করতে হবে। হোমওয়ার্ক করতে হবে। সময়মতো পেপার জমা দিতে হবে। গাইডের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। লাইব্রেরি, ক্যাম্পাস, সেমিনারে নিয়মিত না গেলে চলবে না। সংসার সামলে, পড়াশোনা করে আর সময় পেতাম না নিজের জন্য। খুব ব্যস্ততার মধ্যে দু'বছর কীভাবে গিয়েছে বুঝতেই পারিনি। আই ওয়াজ টোটালি অ্যাবসেন্ট উইথ মাই স্টাডি। এমএস শেষ করার পর ধীরে ধীরে খেয়াল করতে থাকলাম, চোখ মেলে তাকালাম।

জানেন, নাজিয়া বলে, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, মাই হাজব্যান্ড ওয়াজ হাগিং সামওয়ান হার্ডলি ইন আ ওপেন স্ট্রিট। দে ওয়্যার কিসিং ইচ আদার। সাডেনলি আই ওয়াজ অ্যাওয়েকেনড। অ্যান্ড ফাউন্ড মাইসেলফ স্লিপিং অন দ্য সোফা। আমি অনেকদিন এই স্বপ্নের কথা ভেবেছি। নাফিসের সঙ্গে শেয়ার করিনি। আমি বুঝে উঠতে পারতাম না, কেন এই স্বপ্ন আমি দেখলাম। নাফিসের আচরণ খেয়াল করতাম। তাকে বোঝার চেষ্টা করতাম। তারপর একদিন হঠাৎ পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ওপেন হলো। লাস্ট ইয়ার, সামারের ঘটনা। নাফিস বলল, চলো নায়াগ্রা ফলসে যাই। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। দিন-রাত বসে বসে কত কত পরিকল্পনা করলাম। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে নায়াগ্রা ফলসের ডিটেইল খুঁজলাম। স্টেটসে এসে উইকএন্ডগুলোতে নানা জায়গা ঘুরেছি। কিন্তু বিয়ের এতদিন পর নায়াগ্রা যাব ভাবতে খুব ভালো লাগছিল। সেকেন্ড হানিমুনের মতো একটা ব্যাপার। নাফিস বলল, হিজ কাজিন সিস্টার অ্যান্ড হার হাজব্যান্ড উইল অ্যাকম্পানি আস দেয়ার। ভালোই তো, ভাবলাম আমি। ওদেরও বাচ্চা-কাচ্চা নেই। হাজব্যান্ড-ওয়াইফের সুখী সংসার।

প্রাইভেসি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। বরং দুটো ফ্যামিলি এক সঙ্গে গেলে বোর হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না।

নিউইয়র্ক থেকে নায়াগ্রার ট্রেন জার্নি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ভ্রমণ। এখনও। এখন আমি জানি ওই জার্নির শেষে আমার জীবনটা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তবু। মনে হচ্ছিল, সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। পুরোটা রাস্তা আমি ঘুমিয়ে আর বাইরে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। মার্চের সকাল ছিল সেটা। আমরা দুই পরিবার পাশাপাশি রুম নিয়ে একটা মোটেলে উঠলাম।

নায়াগ্রা ফলস! আপনি ভাবতে পারবেন না শুভ, কী ভীষণ কান ফাটানো শব্দ সেখানে। পানির শব্দ এত প্রচণ্ড হতে পারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আর ঠাণ্ডা বল্গাহারা বাতাস। টানেল ধরে যখন জলপ্রপাতের একদিক থেকে অন্যদিকে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড গর্জনের ভেতর হারিয়ে গিয়েছি। হয়তো এ রকম প্রচণ্ড এর চেয়ে তীব্র কোনো গর্জনের ভেতর ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। অনন্ত শব্দের প্রচণ্ডতার মধ্যেও যে মানুষ হারিয়ে যেতে পারে নায়াগ্রা না গেলে বুঝতাম না। নাফিসের বাহু আঁকড়ে ধরে সাউন্ড অ্যান্ড ওয়াটারের অপূর্ব প্রবাহ দেখলাম দিনভর। বিকেলে গেলাম নায়াগ্রার ওয়াইনারি দেখতে। কত রকম যে ওয়াইন তৈরি হয় সেখানে। আঙ্গুর বাগানের ভেতর সাইকেল চালিয়ে ওয়াইনারিগুলোতে ঘুরে বেড়ালাম সারাটা বিকেল। সবাই মিলে ওয়াইন খেলাম পেট ভরে। সন্ধ্যায় আবার যখন ফলসের সামনে দাঁড়ালাম আমার অস্তিত্ব জুড়ে একটা শিহরণ জাগল। অনুভূতিটা কেমন আমি আপনাকে হুবহু বলার চেষ্টা করি। যেন, ফলসের প্রবাহ আমার রক্তধারার মতো করে শরীরের ভেতরে বইছে। আর আমি তার শব্দ স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি। অনেক রাত পর্যন্ত ফলসের পাশে হৈচৈ করলাম। রাতে খেয়ে মোটেলে ফিরলাম। পরদিনের প্ল্যান করা হলো। ফোর্ট, মিউজিয়াম আর নায়াগ্রার অন্ধকার জঙ্গলে পরদিনের ট্যুর। প্ল্যান করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সারাদিনের ক্লান্তি এসে বারবার চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিল।

সকালে উঠে দেখলাম নাফিস নেই পাশে। হয়তো বেরিয়েছে। রেজওয়ানাদের রুমে গিয়ে নক করলাম। নাফিস ওয়াজ দেয়ার। ওর হাজব্যান্ড কোনো কাজে বেরিয়েছিল। নাফিস আমাকে দেখে চমকে উঠল। সাডেনলি আই কেম টু নো দ্যাট সামথিং ওয়াজ হ্যাপেনিং দেয়ার। আমার কেন যেন মনে হলো, দৃশ্যটা আগেও আমি কোথাও দেখেছি। স্বপ্নে হতে পারে। দেজা ভু। আমি স্বপ্নে অস্পষ্টভাবে যে মেয়েটিকে দেখেছি সে যে রেজওয়ানা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম। কী মনে হলো, কিছু না বলে আমি রুমে চলে এলাম।

দ্যাট ওয়াজ দি বিগেনিং। দিনটা খুব কষ্টে কাটল। বার্ডস কান্ট্রিতে অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে হচ্ছিল সেই সশব্দ উচ্ছলতা আমার জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, এই ঘন অন্ধকার শুধু এই মুহূর্তের নয়, আমার অতীত-ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে এই বার্ডস কান্ট্রিতে আঁধার নেমেছে। আই ওয়াজ ইন আ এম্পটি স্পেস। পায়ের নিচে মাটি মাথার ওপরে আকাশ, যেন

কিছু নেই। হঠাৎ মনে হলো, এই দেশে আমার কেউ নেই। টোটালি একা আমি। খুব কষ্ট হতে থাকল। বুকের বাম পাশে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকলাম।

নিউইয়র্কে ফিরে আমি নাফিসের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। আই ট্রায়েড মাই বেস্ট। প্রথমে একটু যেন সাবধান হলো ও। সবই স্বাভাবিক কিন্তু কিছু যেন লুকাচ্ছে। একদিন খুব ঝগড়া হলো। দেন, সে বলল, হি হ্যাজ এভরি রাইট টু চুজ এনাদার পার্টনার। ওপেনলি এসব শুরু করল। বলল, হি কান্ট হেল্প ডুয়িং দিস। একসময় আমি ওর আশা ছেড়ে দিলাম। একবার ভেবেছিলাম দেশে ফিরে যাব। মেডিকেল অ্যানথ্রোপলজি নিয়ে পড়েছি। নিশ্চয়ই একটা কাজ জুটবে। বাবা-মার কথা ভেবে সিদ্ধান্তটা আর এগিয়ে নিতে পারলাম না। দেশে ফিরে তাদের কী বলব? আর দেশে ফিরলে এটা প্রমাণিত হবে, ইউএসএতে আমি নাফিসের ওপর ভর করে এতদিন টিকে ছিলাম। এখন সে নেই দেখেই আমি আর পারছি না। এটা মেনে নিতে আমার কষ্ট হবে। দেন আই ডিসাইডেড টু ডিভোর্স হিম অ্যান্ড স্টে দেয়ার। এখানে একটা বাংলাদেশ আছে জানেন তো? বাংলাদেশের সমাজ, বাজার, অ্যাসোসিয়েশন, সমিতি, দলাদলি, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টি। নাফিসকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেয়ার পর এই সমাজ আমাকে নিয়ে পড়ল। বাঙালি একটা মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে একা থাকবে, তারা ভাবতেই পারল না। ঘরে ঘরে আমাকে নিয়ে কথা হতে থাকল। প্রথমে বোঝাল, তারপর চাপ দিল। তাদের একটাই কথা, গো ব্যাক টু নাফিস। ছেলের চরিত্রের সমস্যা আছে ঠিক, কিন্তু তাই বলে সংসার ভাঙবা? ইগনোর করো। সংসার জীবনে কম্প্রোমাইজ কথাটার একটা গুরুত্ব আছে। আপনি বিবাহিত হলে বুঝতেন। ম্যারিটাল লাইফ মানেই কম্প্রোমাইজড, কনডেন্সড লাইফ। ওরা বলতে থাকল, যেভাবে ছিলে সেভাবেই থাকো। আমাদের মধ্যে থেকে বিপ্লব করতে পারবা না। শেষ পর্যন্ত বাঙালি পাড়া ছেড়ে দিতে হলো। অ্যান্ড দেন আই ফেল্ট লাইক এ ফ্রি উওম্যান এগেইন। কাজ করি, রোজগার করি। পেছনে তাকানোর দরকার হয়নি। পুরো একটা বছর ধরে ডিভোর্সের প্রক্রিয়াটা চলছে, জানেন। আজ বিকেলে পুরোটা শেষ করে এলাম। আর কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। দ্য এন্ড। সিনেমা দেখেন আপনি? শেষে দ্য এন্ড কথাটা কতটা মিনিংফুল জানেন? আমি আজ বুঝতে পারছি দ্য এন্ড মানে কী?

শুভ, আর ইউ দেয়ার?

শুনছি। সমস্যা নেই। বলেন।

সবচেয়ে অবাক করার ব্যাপার কী জানেন? আজকে আমি নাফিসের জন্যই কাঁদছি। পুরুষ মানুষের যত খারাপ ব্যাপার থাকে সবই ওর ছিল। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজেরটা সবার আগে দেখা। পারিবারিক ব্যাপারে কোনো আলাপ-আলোচনার ধার না ধারা। সত্যি কথা বলতে, এই দেশে এতদিন থেকেও এখান থেকে ও কিছুই নেয়নি। নেয় না। কিছুই শেখে না। তারপরও মনে হচ্ছে, কত ভালো ছিল আমাদের ছোট ফ্ল্যাটটা। ওই ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আলাদা করে কষ্ট হচ্ছে আমার। পাঁচ মাস হলো আলাদা থাকছি। আজই প্রথম মনে হলো, আর কখনোই ওই বাসায় আমি ফিরব না। আর কখনোই দেখব না আমার হাতে সাজানো সংসারটা কেমন আছে। সংসার বলতে কিন্তু শুধু স্বামী-স্ত্রী না। ঘরের একটা চামচও সংসার। গ্যাস স্টোভটাও সংসার।

নীরবতা।

যাক। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। কাজের অনেক ক্ষতি করলাম। কিছু মনে করবেন না। আজকের এই সময়টার জন্য আপনাকে মনে রাখব। থ্যাংকস এ লট।

ঘুম পেয়েছে?

না। একটু পর সকাল হবে। আপনার অফিস কখন ছুটি হয়?

ছয়টায়। বের হতে হতে কখনো আট-নয়টাও বেজে যায়। সমস্যা নেই। আরও কিছুক্ষণ বসতে পারব।

থ্যাংকস।

আচ্ছা একটা কথা বলবেন? নাফিস ডিভোর্সের ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছে? সে কি আপনাকে একটুও ভালোবাসে না?

বললাম না, আওয়ার ম্যারেজ ওয়াজ নট ওয়ার্কিং এনিমোর। সে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। সে ভালো করেই জানে রেজওয়ানা ওকে বিয়ে করবে না। হাজব্যান্ডের সঙ্গেই থাকবে, পাশাপাশি নাফিসের সঙ্গেও রিলেশন কন্টিনিউ করবে। কয়েকদিন আগে এক বন্ধু বলল, নাফিস বিয়ে করবে আবার। দেশে যাচ্ছে সামনের মার্চে। হয়তো নতুন আরেকটা বউ নিয়ে আসবে। বলেন, এ রকম একটা মানুষের সঙ্গে কি থাকা যায়? কেউ থাকতে পারবে?

আর একটা ব্যাপার। একজন মানুষের জন্য চরম অপমানকর কোনো বিষয় কী আপনি জানেন? আশা করি আহত হবেন না। এক রাতে নাফিস এসে বলল, সে আমার সঙ্গে কন্টিনিউ করতে চায়। তখনো এক সঙ্গে এক বাসায় থাকি আমরা। আমি বললাম, অন হোয়াট টার্মস আই ক্যান ডু দ্যাট? নাফিস তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারল না। দেন, বলল, তোমার কোনো এক্সট্রাম্যারিটাল কিছু হলে আই উডন্ট আস্ক ইউ আ সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন। ভাবতে পারেন। আমি বললাম, নাফিস, তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী জানো? তুমি কনজুগাল লাইফ বলতে কী বোঝায়, হোয়াট ইজ কলড ম্যারেজ, ইউ অ্যাকচুয়ালি নো নাথিং, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। সে ক্ষেপে গেল। হি স্লাপড মি। একবার পুলিশে ফোন করার কথা ভাবলাম। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কাঁদতে থাকলাম। আর সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম, ইটস ইমপসিবল টু স্টে টুগেদার উইথ হিম।

আমি জানি, আজকে আমার খারাপ স্মৃতিগুলো মনে করা দরকার। নাফিসের জন্য আমার ঘৃণাটাকে তীব্র করা দরকার। কিন্তু শুভ, মানুষের জীবনে দীর্ঘ নির্ঘুম রাতগুলো বরাবরই অদ্ভুত। কোনো একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম। জানেন, আজকে আমার শুধু নাফিসের কথাই মনে হচ্ছে। সবচেয়ে সুখের ঘটনাগুলো প্যানারোমার

ফেস বাই ফেস

মতো চলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। মনে হচ্ছে, ইচ্ছা করলেই যেন আমি ফিরে যেতে পারি আমাদের সেই ছোট ফ্ল্যাটে। খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার। খুবই অদ্ভুত।

স্বপ্নে তুমি কতবার তিরস্কার করেছিলে/লেখাজোখা নেই

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, শোনা হলো মনোযোগ দেয়ার উত্তম পদ্ধতি। কথাটা ডায়েরিতে তুলে নিয়েছি আমি। আমার জীবনে কথাটা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলেই মনে হয়। অনেক দিন ধরে আমি শোনার অভ্যাস করেছি। আমি সাধারণত শুনি। যে কোনো আড্ডা-আলোচনায় লিসেনার হিসেবে ভূমিকা পালন করি। যে কথা বলতে পছন্দ করে তাকে বলতে উৎসাহ দিই। আমার বন্ধু তিন্নি আমাকে বলে, তো মি. লেডি কিলার। তুমি মেয়েদের পটাও কেমনে? কী করো আসলে? কেমনে তারা তোমারে দেখে ভুলে যায়? আমি বলি, দোস্ত, তুমি তো জানো, আমি দেখতে ভালো না। হোদল কুতকুতের মতো চেহারা। কথাও গুছিয়ে বলতে পারি না। পকেটের অবস্থাও তো তুমি জানো। অনলি ওয়ান থিং আই ক্যান ডু ইজ টু লিসেন। আমি শুধু শুনি। তিন্নিকে নিয়ে সমস্যা হলো, একটা সূত্র দেয়ার পর সে সেই সূত্র অনুসারে সবকিছু ব্যাখ্যা করা শুরু করে। ওইদিন থেকে মন দিয়ে ওর কথা শুনতে থাকলে তিন্নি আমাকে সতর্ক করে। তার ঘোরতর সন্দেহ হতে থাকে যে ওকে পটানোর জন্য আমি বাড়তি মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছি।

ও হয়তো ফোনে কথা বলছে, কোনো একটা ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে। আমি মন দিয়ে শুনতে থাকলে বলে, হারামজাদা এখন কি তুমি আমারে পটাইতেছো?

মানে কী? কখন তোমারে পটাইলাম? কী আজব কথা কও। তুমি তো আমার বন্ধু। তোমারে পটানোর কোনো দরকার আছে আমার।

ক্যান তুমি সেদিন কইলা না যে তুমি শুধু শোনো। শুনে শুনে তুমি মেয়েদের পটাও। কয়দিন থেকে আমি লক্ষ্য করতেছি আমি কথা বললে তুমি মন দিয়ে শোনো। ব্যাপার কী? তুমি কি আমারে পটাইতে চাইতেছো?

টিন। তিন্নিকে সংক্ষিপ্ত করে আমরা টিন ডাকি। কবে কী বলছি তুমি ওইটা নিয়া পইড়া রইছো। তুমি জানো না, আমি মাঝে মাঝে বানায়া বানায়া কথা বলি, তুমি তো জানো, নাকি? তুমি জীবনেও আমারে কাউরে পটাইতে বা প্রেম করতে দেখছো, বলো?

তিন্নি একটু আশবস্ত হয়।

শোনো, তুমি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন বানায়া বানায়ে কথা বলবা না, ঠিকাছে? আর শোনো কোনো দিন যেন না দেখি যে তুমি মন দিয়া আমার কথা শুনতেছো। তাইলে তোমার খবর আছে। তুমি মন দিয়া কথা শুনলেই ক্যান জানি আমার হাসি লাগে। মনে হয় তুমি আমারে পটাইতে চাইতেছো।

তিন্নি বি প্রাকটিক্যাল। তুমি জানো না, আমি ক্যাম্পাসে ভালো ছাত্র ছিলাম। ক্লাসে আমারে দেখতা না, আমি কেমনে খালি স্যারদের লেকচার শুনতাম আর নোট নিতাম। ভালো ছাত্র হওয়ার অভ্যাস থেকেই আমার কথা শোনার অভ্যাস হয়া গেছে। এখন তো আমি দেখি, না চাইতেই আমি মন দিয়া সবার কথা শুনি। এইটা আমি কেমনে বাদ দিবো কও তুমি।

আচ্ছা ঠিকাছে তাইলে মন দিয়াই শুইনো।

মন তো দিতেই চাই, তুমি তো নেও না।

তিন্নি এবার সিরিয়াস হয়ে যায়।

শুভ, ডোন্ট সে দ্যাট এগেইন। তুমি ভালো করেই জান তোমার মন আমি নেবো না। সো এইদিকে ট্রাই কইরা তোমার কোনো লাভ নাই। অন্য জায়গায় চেষ্টা করো।

কিন্তু তিন্নি আমাদের বয়স হইতেছে না? তুমিও বিয়া করলা না, আমিও করলাম না। প্রেম করবা না ঠিক আছে, আসো অন্তত বিয়াটা কইরা রাখি। পরে কী হবে সেইটা পরে ঠিক হবে।

বিয়া করলে তুমি যে চান্স নিবা না তার কোনো গ্যারান্টি আছে?

আমি কথার টুইস্ট করি।

চান্স তো তুমি দিলেই হয়। দেও না তো।

তিন্নি আবার সিরিয়াস হয়ে যায়। বলে, শুভ, প্লিজ। এইভাবে বলো না তো। তুমি এইভাবে বললে আমার সমস্যা হয়। মনে হয়, প্রেম করার জন্যই তুমি আমার লগে সম্পর্ক রাখতেছো। এইটা ঠিক না। তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। এই পর্যন্তই। তোমারে বিয়া করা বা তোমার সঙ্গে ডেটিং করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আরেকটা কথা বলি, তুমি আসলে বন্ধুত্ব ব্যাপারটা বোঝো না। বন্ধুত্বে পবিত্রতা বলে একটা ব্যাপার আছে, এইটা তোমার বোঝার শক্তি নাই। আমি তোমার বন্ধু তার মানে এই না যে তোমার সঙ্গে শোবো। আমি তোমার বউ হবো।

কিন্তু তুমি তো কাউরে না কাউরে বিয়া করবা, তাই না?

তিন্নি এবার রেগে যায়, ইউ আর নট দ্যাট ম্যান টু হোম আই'ল ম্যারি। শোনো আমার সময় নষ্ট কইরো না। আমি এইবার রাখি। সি ইউ, টাটা।

ফোন রেখে দেয় তিন্নি। মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে যায়। চিন্তা করি এই মেয়ের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখার দরকার নাই। খুব জটিল-কুটিল প্রকৃতির একটা মেয়ে। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারে না। তুই যখন আমারে বিয়া করবি না তখন প্রতিদিন আমার পিছনে লাইগা রইছোস ক্যান। তোর টমক্রুজ বা জন আব্রাহামরে খুঁজে বের করে বিয়া কইরা ফেল।

এমন হলে, মানে হালকা তর্কের পর মাঝে মাঝে অনেক দিন তিন্নির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয় না। আমি ফোন করি না, সেও না। মনে হয়, তিন্নি আমাকে ভুলে গেছে। যাক ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু এক সপ্তাহ যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন কোনো এক বান্ধবীর বিয়ের শপিংয়ের জন্য ডাকবে। বলবে দোস্ত, তোমার পরিচিত একটা শাড়ির দোকান আছে না বেনারসি পল্লীতে, ওই যে আরিফ না সাদেক ভাইয়ের

দোকান, ওইখানে আমারে নিয়া চলো। ঝগড়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। তিন্নির পক্ষেই এইটা সম্ভব। ক্যাম্পাস থেকে কম করে হলেও পাঁচবার ওকে প্রপোজ করছি। সব সময়ই একই উত্তর। বন্ধুত্ব একটা বিশাল জিনিস। বন্ধুত্বের মধ্যে এইসব আইনো না। তিন্নির কাছে বন্ধুত্ব মানে কী আমি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না। বন্ধুর সীমা কতদূর, জাতির বিবেকের সামনে এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে।

নাজিয়ার সঙ্গে আলাপ শেষ করে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিন্নির ফোন। স্ক্রিনে ওর নামটা দেখে মেজাজটা বিগড়ে যায়। একটা গালি দিতে ইচ্ছা করে। গালিও দেই না, ফোনটা কেটেও দেই না। জাস্ট ফোন ধরে শান্তভাবে বলি, বল।

আমরা একটু বসুন্ধরায় আসছি। তুই আসবি?

আমি কি তোর চাকর? যে যখন ইচ্ছা তুই আমাকে এখানে সেখানে ডাকবি? তুই যে বসুন্ধরায় গেছিস সেইটা কি আমার সঙ্গে আলোচনা করে গেছিস। আর আমরা মানে কি? সঙ্গে কে তোর?

বন্ধু রাগ করো কেন? আসো সঙ্গে আমার সেই বান্ধবী, ওই যে, আইসাই দেখ।

এই এক সমস্যা। কারে না কারে নিয়া বসুন্ধরা সিটিতে ঘুরতেছে। এখন গিয়া ওরে সঙ্গ দিতে হবে। তিন্নির জন্য এক ঘণ্টার জ্যাম পার হয়ে উজানে যাওয়ার মতো তিক্ত অভিজ্ঞতা আর নাই।

নাজিয়ার সঙ্গে আলাপ শেষ করার আগে সে জিজ্ঞেস করল, আমাকে সে তুমি করে বলতে পারে কি-না? আমি বললাম, বলেন, সমস্যা নেই। তাহলে থাক। আমি সংশোধন করে বললাম, বলো। নাজিয়া থ্যাংকস জানালো। বলল, মেয়েদের একটা সিক্সথ সেন্স থাকে, জানো? ছেলেদের কথা শুনলেই তারা বুঝতে পারে সে কেমন মানুষ। ইউ আর এ নাইস পার্সন। আই লাইকড ইউ ভেরি মাচ। আবার কথা বললে খুব ভালো লাগবে। আর একটা কথা। আই শেয়ারড লটস অব থিংস দ্যাট আর ভেরি পার্সোনাল। কিন্তু জানো, কাউকে আমি কখনোই বলি না, ডোন্ট শেয়ার ইট টু এনিবডি। তোমাকেও বলব না, শুধু বলব ইফ ইউ শেয়ার ইট উইথ এনিবডি এলস দেন মেক শিওর দ্যাট হি অর শি ইজ রেসপন্সিবল এনাফ। আমি চাই না বাংলাদেশে আমার সার্কেলে কোনো কারণে আমার জীবন নিয়ে আলোচনা শুরু হোক। আমি এগুলো ঠিক নিতে পারি না।

বসুন্ধরার নিচে গিয়ে তিন্নিকে ফোন দিলাম। সে ফুডকোর্টে, বিএফসির সামনে। মুরগির ফ্রায়েড উইং তিন্নির খুব পছন্দ। আমারও। এই একটা বিষয়ে আমাদের মিল। মুরগি ভাজা ভালো লাগে। কেএফসি সবচেয়ে ভালো। মন আর পকেট ভালো থাকলে আমি তিন্নিকে বলি, আমার অফিসের দিকে আয়। কেএফসিতে মুরগি ভাজা খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে ঝগড়া করি।

অনেক ভিড় বসুন্ধরার ফুডকোর্টে। দূর থেকে দেখলাম, বিএফসির সামনে লিফটের কাছে একা একটা টেবিল দখল করে বসে আছে। বললাম, তোমার বান্ধবী কই?

বলল, কোন বান্ধবী? কার কথা বলতেছো?

তুমি না কইলা কোন বান্ধবী তোমার সঙ্গে আছে?

ছিল, বাট চলে গেছে। সুপর্ণারে চিনো না? ময়মনসিংহ বাড়ি। সুপর্ণার সঙ্গে একসঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম, কই যাই, কী করি। ও বলল, বসুন্ধরায় আসবে। ওর দিদির বাচ্চার জন্য একটা জামা কিনে চলে গেল। আমার আর যেতে ইচ্ছা করল না। বাসায় আর ফিরতে ইচ্ছা করে না। বাসা ছাড়া যাওয়ার যদি আরেকটা জায়গা থাকত। কিছু খাবা?

সুপর্ণা নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ কালো হয়ে গেল। তিন্নি আর আমার মাঝে সুপর্ণা একটা অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ। হয়তো আমাকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্যই সুপর্ণার কথা তোলে তিন্নি। আমি ওর দিকে তাকাই। আমাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছিল কি-না ওর মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করি। তিন্নি আজ বেশ সিরিয়াস, অস্বস্তিতে ফেলার পর যে সুখ তা মুখে নেই। বিষণ্ন, পেনসিভ। সুপর্ণা হয়তো সত্যি এসেছিল। চলে গেছে। আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্য আমি টুইস্ট করি।

খেতে তো চাই অনেক কিছুই।

তিন্নি ধমকে ওঠে, টুইস্ট করবা না। আমার খুব মন খারাপ। কোনো কথা প্যাঁচাবা না। কথা প্যাঁচাইলে বলো, আই রাদার গো।

ইটস ওকে। তুমি খাইছো কিছু?

না। খাইতে ইচ্ছা করে না। আচ্ছা, শুভ চলো না কোথাও বেড়াইতে যাই। পুরান ঢাকায় যাবা? নীরব হোটেলে গেছো কোনোদিন? চলো যাই আজকে।

মাথা খারাপ? কালকে অফিস আছে না? আর পুরান ঢাকায় গেলে ফিরবা কেমনে? যে জ্যাম!

বুঝলা, ঠিক এই কারণে তোমারে আমার অসহ্য লাগে। তুমি একটা কুয়ার ব্যাঙ। যাও দুইটা উইংস নিয়া আসো। সঙ্গে সালাদ আর কোক। ফালতু একটা।

তুই ফালতু। শোন তোরে সাবধান কইরা দেই, আমার সামনে যতক্ষণ থাকবি ওড়না ভালোমতো টাইনা রাখবি।

আমার ওড়না আমি যেমনে রাখি তোর সমস্যা কী?

আমার সমস্যা হয়।

বললাম না, তুই একটা কুয়ার ব্যাঙ? আশপাশে তাকায়ে দেখ। এখনকার ট্রেন্ড এইটা। কয়জন ওড়না নিয়া আসছে দেখ। নে ধর টাকা নে।

পার্স থেকে টাকা বের করে তিন্নি।

আছে। লাগবে না।

রাগ করো ক্যান বন্ধু। আজকে আমি ডাকছি না? মনে করো, আজকে আমি তোমারে খাওয়াইতেছি। যাও, আমি টেবিল পাহারা দিতেছি।

খাবার আনতে আনতে ভাবলাম, নাজিয়ার কথা তিন্নিকে বলা ঠিক হবে কি-না। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না। তিন্নির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তার ভাষ্য অনুসারে, সে চায় আমার একটা প্রেম হোক। আমার জন্য উপযুক্ত একটা পাত্রীর খবর নাকি সে এনে দিতে চায়। কিন্তু এর বেশি কিছু না।

কখনোই তাকে খুব বেশি উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে আমাকে হাতে রেখে দিয়েছে। বছরখানেক আগে তিন্নির কলিগ সুপর্ণার সঙ্গে আমার খুব ভাব জমেছিল। সুপর্ণার কিছু ব্যাপার খুব ইন্টারেস্টিং। জন্ম ময়মনসিংহে। কোনো এক সময় ব্রহ্মপুত্রের পাশে একটা বাড়িতে থাকত। বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড। সুপর্ণার সব কথা ফিরে ফিরে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ময়মনসিংহে থাকার সময়ে চলে যেত। কোনো একটা প্রসঙ্গ উঠলেই বলত, আমরা যখন ময়মনসিংহ ছিলাম তখন আমাদের বাসার পাশে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। শুভ ভাই, আপনি কখনো ময়মনসিংহ গেছেন? ময়মনসিংহ গেলে অবশ্যই ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে যাবেন। ওইখানে গিয়ে আপনি দেখবেন আমার বর্ণনার সঙ্গে দৃশ্যটা মেলে কি-না। যদি মেলে তাহলে ওখান থেকে আমাকে একটা কল দেবেন। আপনি ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসে বাতাসে ফোনটা ধরে আমাকে বাতাসের গান শোনাবেন। কথা দিলেন কিন্তু। মনে থাকে যেন।

আমরা একবার প্ল্যান করলাম সুপর্ণাদের ময়মনসিংহ যাব। ওইখানে গিয়ে ওর পছন্দের জায়গাগুলো ঘুরে আসব। তিন্নি, আমি আর সুপর্ণা। যাওয়ার জন্য অনেক পরিকল্পনা করা হলো। আমার একটা দর্শন আছে, সেটা হলো– পুরনো জায়গাগুলোতে বিশেষ করে শৈশবের স্মৃতিবাহী জায়গাগুলোতে আবার ফিরে যেতে নেই। তাতে শৈশবের মধুর স্মৃতিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আমি অনেক করে সুপর্ণাকে বোঝালাম, দেখেন সুপর্ণা আপনি হয়তো ভাবছেন এইটা, গিয়ে দেখবেন ঠিক আপনি যেভাবে রেখে এসেছেন সেরকমই আছে জায়গাগুলো। আসলে তা না। গিয়ে দেখবেন কিছুই আর তেমন নেই। কিছুই খুঁজে পাবেন না। আরেকবার ভেবে দেখেন। সুপর্ণা বলে, এসব বলেন ক্যান, শুভ ভাই। এইটুকু রাস্তা গেলেই তো ময়মনসিংহ। গাজীপুরের ওপাশে। এইটুক গেলে কী হয়। চলেন। জানেন, আমরা যখন ময়মনসিংহ ছিলাম। তখন একবার ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাচ্ছি। বাবা যাচ্ছে সঙ্গে। তিন্নি থামিয়ে দিল তাকে। বলল, সুপর্ণা আপনারা তো মাগুরাতেও ছিলেন। সেখানকার কথা কিছু বলেন না কেন? চলেন ময়মনসিংহ না গিয়ে মাগুরা যাই।

সুপর্ণা একবারে চুপ হয়ে যায়। বলে, কী বলেন, তিন্নি। মাগুরা গিয়ে তো দিনে দিনে ফিরতে পারবেন না। বাসায় তো বাবা একা। ওনাকে রেখে কী এক রাত বাইরে থাকতে পারব। তিন্নি বলে, কিন্তু আমার তো ময়মনসিংহ যাইতে ইচ্ছা করে না। রিকশা ছাড়া আর কিছু তো নাই দেখার মতো ওইখানে। সুপর্ণার খুব মন খারাপ হয়। বলে, তিন্নি আপনি কখনো ব্রহ্মপুত্রের সামনে দাঁড়িয়েছেন ভরা বর্ষায়। যদি দাঁড়ান তবে দেখবেন। আপনি অবাক হয়ে যাবেন। জোরে জোরে নিঃশবাস নেবেন। আমরা যখন ময়মনসিংহ ছিলাম, বাবা ওইরকম সকাল বেলা আমাদের ব্রহ্মপুত্রের পাশে দাঁড় করিয়ে বলতেন, জোরে জোরে নিঃশবাস নে মা।

তিন্নি বলে, কিন্তু আমি যাচ্ছি না। আপনারা গেলে যান। আমি যাইতেছি না। বলতে গেলে, তিন্নিই ইনিশিয়েট করেছিল ময়মনসিংহ যাওয়ার প্রস্তাব। আমাদের অতি

আগ্রহ দেখে পিছিয়ে গেল। আমি তিন্নির মুখ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তার মুখ বলছে, শুভ তুমিও যাবা না। ঘটনা সত্যি, আড্ডা থেকে বাসায় ফিরতেই তিন্নির ফোন।

তুমি ময়মনসিংহ যাওয়ার জন্য এত উতলা হইলা ক্যান বলো দেখি। ময়মনসিংহে কী? আর সুপর্ণার সঙ্গে তোমার এত কিসের আলাপ। সুপর্ণা ময়মনসিংহ ময়মনসিংহ করলে তুমি তাল দেও কেন? তোমারে লাস্ট একটা কথা বলি, তুমি যদি ওর সঙ্গে ময়মনসিংহ যাও তাইলে ধইরা নিবা তোমার সঙ্গে আমার কোনো রিলেশন নাই। আর তুমি সুপর্ণার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হইতেছো যে সেইটা কি জাইনা-শুইনা হইতেছো? ও কেমন মেয়ে সে সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে? বাবা আর সে ছাড়া ফ্যামিলিতে আর কেউ নাই। মেয়েটা খুব আবেগী, বুঝলা। ওরে তুমি প্রেমে ফেলতে পারো। বাট কনসিকুয়েন্সগুলা খেয়াল রাইখো। ওর বাবা এই বয়সে কিছুতেই তোমাদের বিয়া মেনে নিবে না। মাইন্ড ইট।

তিন্নি এর মধ্যে প্রেম-বিয়া কোত্থেকে এলো? তুমি এইগুলা কী বলতেছো! আজব। সুপর্ণার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একদিনও তো তোমার উপস্থিতি ছাড়া কথাও বললাম না।

তিন্নি বলে, তার মানে কী? তুমি আমারে বাইপাস করে সুপর্ণার লগে মিট করতে চাইতেছো। ওকে দেন ইউ হ্যাভ টু চুজ, কার সঙ্গে তুমি রিলেশন রাখবা সেইটা ঠিক করে নাও। দুইজনরে একসঙ্গে পাবা না। তিন্নির মুখটা মনে পড়ল। ঝগড়াটে একটা মুখ। চোখা লম্বা, স্লিম। দুটো মায়া ধরানো চোখ। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। বলল, তুমি আমারে বাইপাস করে এখন সুপর্ণার সঙ্গে মিট করতে চাও। শুভ, তুমি এইটা বলতে পারলা।

তিন্নিকে নিয়ে যন্ত্রণার শেষ নাই। ময়মনসিংহ যাওয়া লাটে উঠল। সুপর্ণার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ফেসবুকে একদিন দেখি তিন্নির ফ্রেন্ড লিস্টে সুপর্ণার ছবি। অ্যাড করে নিলাম। একটা মেসেজ পাঠালাম। লিখলাম, শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা? সুপর্ণা রিকুয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে উত্তর দিল। এটা কী? শীতকাল কবে আসবে মানে কী? উত্তর দিলাম, দেখেন না এ বছর পৌষ চলে যাচ্ছে তারপরও ঢাকা শহরে শীত আসার নাম-গন্ধ নাই। তাই জিজ্ঞেস করলাম, শীতকাল কবে আসবে? সুপর্ণা বলে, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি কিছু মিন করছেন, ভাইয়া। বলেন না, কী মিন করছেন। পরের মেসেজে আমি লিখলাম, সুপর্ণা আসলে এটা ভাস্কর চক্রবর্তীর একটা কবিতার লাইন। প্রত্যেক শীতের আগে এই লাইনটার কথা আমার মনে পড়ে। এবার পুরো শীতেই মনে পড়ছে। একটা-দুটা মেসেজ দিতে দিতে সুপর্ণার সঙ্গে আলাপ জমে ওঠে। সুপর্ণা বোঝে, আমিও বুঝি, তিন্নিকে এই নতুন যোগাযোগের কথা জানানো যাবে না। আলাপ চালু হওয়ার পর ধীরে ধীরে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি বলি, সুপর্ণা তুমি অনলাইনে আসো না কেন? অনলাইনে আসলে তো আলাপ জমে। সুপর্ণা বলে, সামনের শীতটা আসুক। আসব অনলাইনে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। আমি বলি, অনলাইনে আসতে যদি এত দেরি হয় তাহলে একদিন বাস্তবে দেখা দেও। তোমাকে দেখি। সুপর্ণা বলে, দেখেছো তো। আরও দেখতে চাই। একদিন চলো, বিকেল বেলা ঘুরি।

সুপর্ণা একদিন ঠিক সময় বের করে বিকেলে ফোন দেয়।

বলে কোথায় যাবে?

আমি চমকে যাই।

আজকেই?

আজ না তো কী? বের হও।

কোথায় যাবে?

ক্যাফে ম্যাংগো।

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের মাথায় সুপর্ণা আমার জন্য ওয়েট করে। টানটান করে চুল বাঁধা। চশমা পরা মুখটা অনেক ফোলা ফোলা। আড়ংয়ের একটা গোড়ালি কাটা পাজামা পরেছে। জামাটা মেরুন। ওড়না একদিকে ফেলে রাখা। ক্যাফে ম্যাংগোতে গিয়ে দেখলাম, কোনো জায়গা খালি নেই। আলাপ তো দূরের কথা, বসারই উপায় নেই। বের হয়ে ডিঙ্গির দিকে গেলাম। ধানমণ্ডি লেকের ধারে ডিঙ্গি রেস্টুরেন্ট। কোনো রকমে বসার একটা জায়গা মিলল। এটা-সেটা কথা হলো। সুপর্ণা বলে, তুমি এত নার্ভাস কেন? তিন্নির ভয়ে?

কই নার্ভাস কোথায়? তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবে?

তিন্নির সঙ্গে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে বা তিন্নি কি তোমার বউ?

কী বলো, সম্পর্ক থাকলে জানতা না এতদিনে?

তাহলে ওকে এত ভয় পাও কেন?

ভয় পাই কোথায়? বন্ধু না? বন্ধু হিসেবে ভালোমন্দ কথা তো বলতেই পারে। আমিও বলতে পারি।

ডিঙ্গিতে কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়ি দু'জনে। ধানমণ্ডি লেকের ওপর ব্রিজে দাঁড়িয়ে কথা বলি। সন্ধ্যাবেলা আকাশ আলো করে চাঁদ উঠেছে। দূরে রাস্তার আলোর আভা। আজকের রাতটা পূর্ণিমা। লেকের ধারের গাছগুলো দীর্ঘ ও গভীর ছায়া ফেলেছে লেকের জলে। সুপর্ণা বলে, মাঝে মাঝে এখানে আসতে ইচ্ছা করে। আসবে, বললে? আমি অবাক হয়ে সুপর্ণার দিকে তাকাই। আবহ ঘন হয়ে আসার আগেই বলি, সুপর্ণা তোমাকে খোলা চুলেই কিন্তু বেশি ভালো লাগে। সুপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে চুল খুলে দেয়। বলে, জানো আমরা যখন ময়মনসিংহ থাকতাম তখন নদীর ঠিক কিনারেই ছিল আমাদের বাসা। সন্ধ্যাবেলা আমরা এভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নদী দেখতাম। ময়মনসিংহ যেতে খুব ইচ্ছা করে। যাবে একবার আমার সঙ্গে? খুব ভালো লাগবে যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও। তোমাকে আমি সেই বাড়িটায় নিয়ে যাব। আমাদের সেই বাড়িটার সামনে একটা বড় বরই গাছ আছে। বরই খুব ছোট ছোট। কিন্তু খুব মিষ্টি।

তুমি আরেক সিন্ধুর পারে জেগে ওঠো, আরেক নগরে

মাঝে মাঝে মনে হতো যেন সেই শৈশবে পড়ে আছে সুপর্ণা। বলত, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে গেলে দেখবে একটা বড় বটগাছ। এত বড় একটা বটগাছ। সেবার কলকাতা থেকে পিসিরা এলো, তো বাবা অনেকদূর পথ হেঁটে সেই বটগাছটার কাছে নিয়ে গেল আমাদের। পিসি ছিল, পিসতুতো বোনেরা ছিল। বটগাছটার ধারে অনেক মটরশুঁটির ক্ষেত। আমরা চুরি করে মটরশুঁটি তুললাম। সেগুলো খেতে খেতে ভ্যানে করে আবার নদীর কাছে ফিরলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে। কখন সূর্য ডুবল খেয়াল করিনি কেউ। ব্রহ্মপুত্রে সূর্য একদম অন্যরকম করে ডোবে। জানো? একদম ঝুপ করে ডুবে যায়। তুমি ময়মনসিংহ গেলে সবকিছুই দেখতে পাবে।

শীতকাল ছাড়া তো আর মটরশুঁটির ক্ষেত পাব না, তাই না?

সুপর্ণা হাসে আমার দিকে চেয়ে, বলে মটরশুঁটি না পেলে অন্যকিছু পাবে। হাত আঁকড়ে ধরে সুপর্ণা। বলে, তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো? আমি বলি, আমি জানি না আমি তোমাকে ভালোবাসি কি-না। আই অ্যাম নট সিওর। কিন্তু তোমার কথা আমি ভাবি। তোমার কথা ভাবলে আমার ময়মনসিংহ যেতে ইচ্ছা করে। রিকশায় যেতে যেতে ওর কথা শুনতে শুনতে ওকে কাছে টেনে চুমো খেয়ে বসি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লোকে যেভাবে ডাব উঁচু করে ধরে ডাবের রস খায়, সেভাবে সুপর্ণার মুখ উঁচু করে ধরে আমি সুপর্ণার ঠোঁটে চুমো খাই। সুপর্ণা বলে, তুমি আমার দিদির ছবি দেখেছো? দিদি কিন্তু অনেক সুন্দর। আমার থেকে সুন্দর। কিন্তু জানো তো, দিদি অনেক আগে বিয়ে করে ফেলেছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করেছে। দিদি যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ত তখন। এ রকম কেন করল বলো তো? দিদি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। জানো, দিদি পালিয়ে বিয়ে করার পর বাবা বলত, আমি ধরে নিচ্ছি আমার মেয়ে একটাই। তুমি মুসলিম যে এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে বাবা কোনোদিন মেনে নেবে না। আর আমি কি দিদির মতো করতে পারব?

সুপর্ণা কেঁদে ফেলে। কাঁদলে ফোঁস ফোঁস করে গোখরা সাপের মতো মাথা দোলাতে থাকে। ওকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরি আমি। কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা মাথায় আসে না। সুপর্ণা আমার বাহুতে হেলান দেয়।

ধীরে ধীরে সুপর্ণার গল্প বদলে যায়। সুপর্ণা মাগুরার কথা বলে। বলে, মাগুরার জীবনটা আমার জন্য একটা বিভীষিকার মতো ছিল। আমরা যখন মাগুরা থাকতাম, তখন কেবল কলেজে উঠেছি। খুব সুন্দর ছিলাম কি? আমার দিকে তাকিয়ে বলো তো

আমি কি খুব সুন্দর ছিলাম? আমি জানি, আমি দিদির চেয়ে কম সুন্দর। কিন্তু দিদিকে ছাড়া একা একাও কি আমি সুন্দর? বলো না। বাবা আমাকে নিয়ে খুব টেনশনে থাকত। একা বেরোলেই বখাটে ছেলেরা আমার পেছনে লাগত। কী যে ভয়ানক একটা সময় গেছে। প্রতিদিন বাড়ি ফিরলে মনে হতো একটা বছর পার করে এলাম। কলেজে মনিরুল নামে একটা ছেলে আমার প্রেমে পড়ে গেল। প্রথমে ওরা ছাত্রলীগ করত, পরে ছাত্রদল। বাসার সামনে এসে বসে থাকত হোন্ডা দাঁড় করিয়ে। বাবা পুলিশে জানাল। তারা কিছু করতে পারল না। সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে ওরা। কেউ ওদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমি খুব ভয় পেতাম। দুইটা বছর আমি সন্ধ্যার পর বের হতাম না। কোথাও গেলে মা সঙ্গে যেত। কোনোরকমে পরীক্ষা দিয়ে সবাই মিলে পালিয়ে ঢাকা চলে এলাম। বাবা বদলির জন্য তদবির করে পারল না। শেষে আগাম রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিল। এক বছর ছিল চাকরির। আমার জন্য কত কষ্ট করেছে, একবার ভাবো। বাবাকে কষ্ট দিতে মন চায় না।

তুমি কি মনিরুল নামে কারো নাম কোনোদিন শুনেছো? মনে করার চেষ্টা করো তো। তোমার হয়তো মনে পড়বে। আমি অবশ্য অনেকদিন জানতাম না যে, মনিরুলের কথা সবাই জানে। পেপারে পর্যন্ত তার কথা আলোচনা হয়েছে। বিখ্যাত? না না। কুখ্যাত বলতে পার।

একবার কলকাতায় যাচ্ছি দুর্গাপূজার সময়। মাগুরায় বাস থামল। দেখি বিল্ডিংয়ের দেয়ালে লেখা, মনিরুল হত্যার বিচার চাই। খুব অবাক হয়ে গেলাম। মাগুরা ছাড়ার পাঁচ বছর পরের কথা। লেখাটা দেখে আমার কেমন যে লাগল। ঠিক বোঝাতে পারব না। মনিরুলের চেহারাটা মনে পড়ল। শুকনো হালকা-পলকা একটা ছেলে। পরে হয়তো বড় গুণ্ডা হয়ে উঠেছিল। এত জ্বালিয়েছিল! কেন যেন বাবাকে কিছু বলার ইচ্ছা করল না। মৃত মনিরুলের জন্য ভেতরে ভেতরে একটা অচেনা কান্না এসে ভর করল। যেন নিঃশবাস বন্ধ হয়ে আসবে। দমবন্ধ একটা ব্যাপার। তুমি কাউকে বলতে পারবে না, কাউকে বোঝাতে পারবে না, কীসের জন্য যে তুমি কাঁদবে তুমি নিজেও জানতে পারবে না। এজন্যই মনিরুলের কথা কাউকে বলতে পারি না আমি। যদি ভাব, যদি ভালো করে ভেবে দেখো, তবে মনিরুলই আমার প্রথম প্রেমিক। প্রথম যে একদিন রাস্তা আটকে আমাকে বলেছিল, সে আমাকে ভালোবাসে। শুনে আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল পা থেকে রক্তস্রোত নিমেষে মাথায় উঠে গেল। কোনোদিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। খুব ভয় পেয়েছিলাম। ভীষণ ভয়ে আমি কেঁপে উঠেছিলাম। আর কলেজে যেতে পারিনি। বাসায় ফিরে তিনদিনের জ্বরে বিছানা নিয়েছিলাম। মা শুধু জিজ্ঞেস করত, কিছু করেছে কি-না। আমি অত কিছু তো বুঝতাম না। মা কেন বারবার জিজ্ঞেস করেছিল তা ভেবে এখনও নতুন করে একটা জ্বর ঘিরে ধরে আমাকে।

শুভ, তুমি কি আমার কথা শুনছো? তোমার কি মাগুরার গল্প ভালো লাগছে? ভালো না লাগলে বলো। মাগুরার কথা বলতে আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু তুমি

তো আমার প্রেমিক। তোমাকে বলছি। তোমার কি মনে হয় দেয়ালের ওই লেখাটা দেখে মনিরুলের জন্য আমার মধ্যে কিছুটা প্রেম তৈরি হয়েছে?

আমি চুপ করে থাকি। বলি, আমি জানি না। কারো পরিচিত কোনো মানুষ খুন হলে কেমন অনুভূতি হয় আমি জানি না। তুমি হয়তো মৃত্যুর ঘটনাটাতেই মুষড়ে পড়েছিলে। আমি ঠিক জানি না।

তিন্নি হঠাৎ একদিন আবিস্কার করে আমাকে আর সুপর্ণাকে একসঙ্গে। রিকশায় করে যাচ্ছিলাম। তিন্নি সিএনজিতে আমাদের ক্রস করে এগিয়ে ফোন দিল। বলল, তোমার পাশে ওইটা সুপর্ণা না? আমি বললাম, হ্যাঁ।

হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে তিন্নি ফোন রেখে দিল।

একবার রিকশায় একসঙ্গে দেখার পর তিন্নি সুপর্ণা, আমার ও সুপর্ণার পরিবারের সঙ্গে কী করেছিল সেসব এখন ইতিহাস। আর কীভাবে সুপর্ণার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়েছিল ওরা বাবার হস্তক্ষেপে তাও এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। তখন থেকেই তিন্নির সঙ্গে এসব আর শেয়ার করি না আমি। নাজিয়ার কথাও বলব না নিশ্চিত। বললেই সে চেপে ধরবে। দিনে দশবার নাজিয়ার প্রোফাইল ভিজিট করবে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমার সম্পর্কে তার অনুভূতি জেনে নেয়ার চেষ্টা করবে। আমি তিন্নিকে মাঝে মাঝে বলি, তিন্নি তুই তো আমার বন্ধু। তাই না? আর কিছু তো না, তাই না? তাহলে তুই সুপর্ণা আর আমার মধ্যে দূরত্বটা তৈরি করলি কেন?

শুভ, দেখো আমি তোমার কথা ভাবি নাই। আমি মেয়েটার কথা ভাবছি। ক্রস রিলিজিয়ন বিয়ের ব্যাপারটা তুমি একবার ভাইবা দেখছো। ওর বাবার কথা ভাইবা দেখো একবার তুমি। উনি কি কোনোভাবে তোমাদের রিলেশনটা মেনে নিতে পারতেন। ধরলাম ওর দিকটা ঠিক আছে। কিন্তু তোমার দিকটা একবার ভাবো, তুমি কি পারতা ওরে বিয়া করতে! তুমি একটা অপরিণামদর্শী সম্পর্কে জড়াইছো। এতটা আগানোর আগে তুমি তো আমার সঙ্গে ডিসকাস কইরা নিতে পারতা। নাকি?

আমি চুপ করে থাকি। সুপর্ণার জন্য খারাপ লাগতে থাকে। তিন্নি তখন ক্রূর একটা হাসি দেয়, বলে, দোস্ত এইটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে। এই যে যখন একটা ভাঙা সম্পর্কের দুইধারে বইসা দুইজন তড়পাইতে থাকে, কানতে থাকে। এইটার আলাদা একটা মজা আছে। তিন্নির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। মাঝে মাঝে মনে হয় ও যেন কোনো একটা গভীর ক্ষত নিয়ে জীবনযাপন করছে। কোনো একটা ক্রূরতা যেন ওকে ঘিরে রাখে। কিন্তু সত্যি বলতে, ওর কোনো ক্ষতের দাগ আমি দেখি নাই। ক্যাম্পাস থেকেই দেখছি। ওর জীবনে কোনো টুইস্ট কখনো আসে নাই।

চিকেন ফ্রাই নিয়ে এসে তিন্নির সামনে রাখি। তিন্নি বলে, তুমি আমার হাতটা একবার ধরবা? শক্ত করে ধরবা একবার হাতটা? আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকাই। হাত ধরাটা কোনো ব্যাপার না। হাতটা ধরতেই সে বলে, তোমার শরীর এত গরম কেন? জ্বর নাকি তোমার?

না আমার জ্বর না। কিন্তু তোমার শরীর অত্যধিক ঠাণ্ডা।

কিছুক্ষণ তিন্নির হাত ধরে থাকি। তিন্নি বলে, থ্যাংকস ফ্রেন্ড। এবার নাও, খাও। কোক সিপিং করতে করতে তিন্নি বলে, জানো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ঘর ছাড়া যদি কোনো একটা জায়গা থাকত যেখানে ফেরা যায়। ইচ্ছামতো ঘোরা যায়। কথা না বইলা অনেকক্ষণ থাকা যায়। ধর ৩৬ ঘণ্টা তুমি কারো সঙ্গে কথা না বইলা থাকলা। দেন, বের হইলা। নিজের সঙ্গে কথা বললা। মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো, ওয়ান থিং উই আর ডেফিনিটলি মিসিং, দ্যাট ইজ আওয়ারসেলফ। তিন্নির সমস্যা কী সেটা আমি বুঝতে পারি না। একবার বলি, তুমি বিয়া কইরা ফেলো। তোমার বাবা-মারে বলো ছেলে খুঁজতে। একবার বলি, চলো বিয়ে করে ফেলি। দুইজন মিলে একটা সুন্দর ঘর বানাই। কখনো বলি, তিন্নি ইউ আর টোটালি ডিসগাস্টিং। তোমারে কোনোভাবেই আমি বুঝতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন? তোমারে কি সাপে ধরছে?

আমি বুঝতে পারি, আজ অল্প সময়ের জন্য হলেও একটা বৈরাগ্য এসে ভর করেছে ওর মধ্যে। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েও যে মেয়েরা বিয়ে করে না তাদের মধ্যে নাকি এ রকম বৈরাগ্য দেখা দেয়। হয়তো সুপর্ণা আসেনি, ও একাই বসুন্ধরায় এসে বিকেল থেকে একা বসে আছে। এমনে বসে বসে মানুষ ভেতরে ভেতরে কাঁদে।

তোমার কত হইলো বয়স? টুয়েনটি নাইন। থার্টি হবে আগামী মার্চে।

আচ্ছা তোমার এক বন্ধুর কথা বলছিলা না, ওই যে তারেক না কি যেন নাম। হ্যান্ডসাম, বড় লোকের পোলা। ওইটার খবর কী?

তুমি কি আফিফের কথা বলতেছো নাকি? তারেক তো এমএনসিতে কাজ করে। তুমি মনে হয় আফিফের কথা বলতেছো।

আফিফ তোমার প্রেমে পড়ল না একবার?

হ্যাঁ।

দেন, কী হইলো?

কী আর হবে, তুমি জানো না শুভ, আমার সঙ্গে বসে কেউ যদি অন্য মেয়ের দিকে লোভাতুর চোখে তাকায় তাইলে সে আর যা-ই হোক আমার স্বামী হইতে পারবে না?

তিন্নি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, কে ভালো তারেক না আফিফ। দু'জন দুই রকম। মিল একটাই। লম্বা-চওড়া, ফিগার ভালো। তিন্নির পছন্দের পুরুষের রূপরেখা দেখে আমি নিজেকে পরখ করে একেবারে কেঁচো বনে যাই। বেঁটে খাটো একটা লোক হয়ে তিন্নির পছন্দের তালিকায় নিজেকে স্থাপন করতে গেলেই কেমন একটা অস্বস্তি জাগে।

আর ফারুক, ফারুকের কী হইছে?

ফারুকের তো বিয়ে হয়ে গেছে। বউয়ের টাকায় জাপান গেছে জানো না? তোমাকে বললাম না একদিন, বউয়ের টাকায় জাপান গেল যে। কাওয়ার্ড একটা। কোনো পার্টস থাকলে কেউ বউয়ের আঁচল ধরে জাপান যাইতে পারে?

আমি মনে মনে চিন্তা করি, দেন, নো ওয়ান লেফট বিহাইন্ড। আমি তিন্নির জন্য চিন্তা করি। ওর মধ্যে ইদানীং একটা বিষণ্নতা এসেছে। চোখে ক্লান্তি বাসা করছে। কয়েকটা খড়কুটো ফেলে রেখে গেছে। ওর আসলে কোনো উপযুক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন। এত সুন্দর একটা মেয়ে। এত ভালো ফিগার। টল, স্লিম, সেক্সি। নওরোজ ভাইয়ের মতো স্পষ্টবাদী লোক হলে বলত, শি নিডস আ গুড ফাক। কথাটা ভাবতেই কান গরম হয়ে গেল। আমি ভাবতেও পারি না, এই সময়ে একটা মেয়ে টুয়েনটি নাইন, থার্টি পর্যন্ত উইদাউট এনি সেক্সুয়াল রিলেশন কীভাবে টিকে আছে। এসব অবশ্য ওর ভাষ্য। তবে তিন্নির এ ভাষ্যে আমার আস্থা আছে। অনেক বছর ধরে দেখতে দেখতে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। আমি অধিকাংশ সময় ওর কথা বিশবাস করি।

আমি বললাম, বন্ধু, তুমি একটু ভাবো। ভেবে দেখ, কাউকে তোমার পছন্দ হয় কি-না। ছেলে হিসেবে আমার মধ্যে অলরেডি ফ্রাসটেশন ঢুকে গেছে। তোমার তো আরও বেশি এইটা হওয়ার কথা। তাই না?

তিন্নি কোনো কথা বলে না। শুধু বাম হাতটার ওপর আলতো করে হাতটা রাখে। বলে, বন্ধু হিসেবে যদি তুইও না থাকতি তাহলে আমি মনে হয় এতদিনে ধ্বংস হয়া যাইতাম। তিন্নির এসব কথায় নাচার কোনো কারণ নেই। সে এইগুলা মিন করে বলল না মুখে এলো বলে বলেই ফেলল এইটা বোঝার জন্য সারারাত গবেষণা করতে হবে। তবু তিন্নির সঙ্গে আমি আছি। কীসের টানে কে জানে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিন্নি আমার বোরিং জীবনের একটা আবশ্যিক অংশ হয়ে গেছে। চাকরির মতো। বসুন্ধরায় বসে দীর্ঘ সময়জুড়ে অল্প অল্প কথার পর রিকশায় করে অনেক ঘোরাপথে তিন্নিকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরি আমি।

নাজিয়া আর তিন্নিকে পাশাপাশি রেখে ভাবি। দু'জন দুইটা প্রেক্ষাপটে বসে একই দিনে দুই ভাষায় বলল, স্টে উইথ মি। মনের কোনো এক কোনায় কোথাও একটা গর্ববোধ উঁকি দিচ্ছে। তুলা রাশির জাতক হিসেবে আমি শান্ত, স্থির আর গুড লিসেনার। এটুকুই হয়তো যথেষ্ট, কারো আস্থা অর্জনের জন্য। নওরোজ ভাই বলে, মেয়েরা আসলে নিরাপত্তা চায়। যে কোনো ধরনের শেয়ারিংয়ের আগে তারা ভাবে আপনার দিক থেকে কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি-না। মেয়েরা আপনার সঙ্গে ডেট করতে যাবে তখনই, যখন সে নিশ্চিত হবে আপনার ঘরে কোনো ক্যামেরা লুকানো নেই। আপনি ডেটিংয়ের কথা বলে বেড়াবেন না। যখন বুঝবে আপনি তার প্রাইভেসির ব্যাপারে সচেতন, যখন সিওর হবে যে আপনি তাদের আক্রমণ করবেন না, বরং তাদের বশ্যতা মেনে নেবেন তখনই তারা আপনার সঙ্গে শেয়ার করবে। আপনি বিশবস্ত, কিন্তু তিন্নি আপনার সঙ্গে কিছুই শেয়ার করছে না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আপনি বন্ধুত্বের নামে নিরাপদ সঙ্গী, বলা যায় প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছেন।

অদ্ভুত এই লোক নওরোজ ভাই। মিয়া মোহাম্মদ নওরোজ। ফেসবুকে পরিচয়। ১২৫টা ফ্যানক্লাবের সদস্য। নিজে দুইটা ফ্যান ক্লাব অপারেট করেন। একটা নিজের ফ্যান ক্লাব, একটা সালমান খানের। তার ভাষ্য মতে, সালমান খানই তার আদর্শ। পৌরুষ বলতে তিনি সালমানকে বুঝে থাকেন। পুরুষের নাকি জনসমক্ষে খালি গায়ে

পাবলিক শো করার যোগ্যতা থাকতে হয়। ফেসবুকে মাঝে খুব আলাপ হতো। আমাকে অনলাইনে দেখলেই হাই হ্যালো করেন। বলেন, আজকে কোনো মাছ পড়ল?

কী বলেন এসব নওরোজ ভাই।

তাহলে সারাদিন বসে বসে কী করেন? দেখি তো সারাদিন বড়শি ফেলে রাখছেন।

কী আর করব নওরোজ ভাই। অনলাইনে তো থাকতেই হয়। কিছু করার না থাকলে এর-ওর প্রোফাইলে ঘুরি। অ্যালবাম দেখি। পেজগুলার মেম্বার হই।

কিছুদিনের আলাপের পর ফোন নাম্বার বিনিময় হলো। একদিন নিজে ড্রাইভ করে অফিসের সামনে এসে ফোন দিলেন। চলেন আপনাকে শর্মা খাওয়াই। শর্মা হাউসে গেছেন কখনো? হাতিরপুলে। খুব মজার শর্মা হয়। চলেন যাই একদিন।

নওরোজ ভাইকে দেখে আমি খুব অবাক। সালমান খানের অনুসারী কিন্তু নিজে একেবারে হাড্ডিসার দেহ নিয়ে টিকে আছেন। একেবারে পলকা শরীর। ওনার গাড়িতে করে হাতিরপুল যেতে যেতে আলাপ হতে থাকল।

আপনি কি জানে তু ইয়া জানে না ছবিটা দেখছেন। না দেখলে একবার দেখে নেবেন। নইলে বাসায় আসেন একদিন। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ছবিটা দেখব দুই জনে। আপনার ভাবীর রান্নার হাত কিন্তু খুব ভালো। আপনার ভাবীকে অ্যাড করেছেন না, ফ্রেন্ডলিস্টে? সেও তো আপনাকে চেনে। আপনার কথা বলি তো। ফেসবুকে যা যা হয় সবই বলি। আসেন, এক শুক্রবার ফোন দিয়ে চলে আসেন। আপনাকে ফোন দিতে বললে তো কোনোদিন দেবেন না। আমিই বরং আপনার ভাবীর কাছে ডেট নিয়ে আপনাকে ফোন দেবো।

শর্মা খেতে খেতে নওরোজ ভাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। আশপাশের টেবিলে বসা টিনএজার মেয়েদের নিয়ে কুইক কমেন্ট করেন, ফিসফিস করে। মেয়েদের ব্যাপারে উনি একেবারে চলন্ত বিশবকোষ। কথাবার্তায় কোনো রাখঢাক নেই। যে কোনো বিষয়ে আনসেন্সরড ভাষ্য দেন। ব্যক্তিগত-অব্যক্তিগত ব্যাপারের সীমানা যেন ওনার কাছে এসে একাকার হয়ে গেছে।

তোমার বয়েস আমি ভালোবাসি

নওরোজ ভাই বলেন– মি. শুভ, আপনাকে একটা কথা বলি। আমার জীবনের একটা শিক্ষা আপনাকে উইদাউট এনি ফি জানিয়ে রাখি। আপনার কাজে লাগলেও লাগতে পারে। যদি কখনো কাজে লাগে জাস্ট একটা মেসেজ করে জানাবেন। সিম্পল একটা থ্যাংকস জানাবেন। আমি যা বোঝার বুঝে নেবো। জীবনের সেই শিক্ষাটা কী জানেন? চারদিকে যা ঘটছে সবটাই একটা খেলার অংশ। লাইফ ইজ আ গেম। আপনাকে কেউ গোল দিচ্ছে অথবা আপনি কাউকে গোল দিচ্ছেন। আপনি জানেন বা না জানেন, আপনি এই খেলার অংশ। যারা টেস্ট খেলে মজা পায় তাদের আমি বলি, আমি টুয়েন্টি টুয়েন্টির প্লেয়ার। বিশ ওভারের জীবন, যা রান করবেন, যা উইকেট নেবেন সবই বিশ ওভারের মধ্যে। জীবনে কোনো উইকেট নিয়েছেন? নাকি বৃথাই বলের পেছনে দৌড়ে গেছেন? আমি সরাসরি কোনো উত্তর দেই না।

বলি, নওরোজ ভাই, ইন ফ্যাক্ট আমি ক্রিকেট খেলাটা ভালো বুঝি না।

কী বলেন? ক্রিকেট বোঝে না এমন লোক কি দুনিয়ায় আছে নাকি? আমার অভিজ্ঞতা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। আমি আগে ফার্স্ট ডিভিশন লীগে খেলতাম। আকরামরা আমাদের জুনিয়র ছিল। একদিন ভাবলাম, ধুর এইসব খেলে কী হবে? জীবনের খেলাটাই তো খেলা হলো না। সব কিছু একেবারে তেঁতো হয়ে যাচ্ছিল। রাতের পর রাত ঘুম হতো না। আমি প্রত্যেক রাতে বসে বসে কাঁদতাম। আপনার ভাবী গভীর রাতে উঠে দেখত আমি কাঁদছি। বলেছি না, ও আমাকে খুব ভালোবাসে। ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে সে রাত জেগে বসে আমার কান্না দেখত। আমি বলতাম রওনক ঘুমাতে যাও। ও বলত, কী হয়েছে তোমার? ঘুমাও না কেন? কার কথা মনে করে কাঁদো? কারো প্রেমে পড়েছো? আমাকে বলো। আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদি। রওনক খুব ভালো মেয়ে। ১৯ বছরের বিবাহিত জীবন আমাদের। প্রতিদিন সে আমার সঙ্গে আছে। আমার আশ্রয়ের মতো। কিন্তু রওনক জানত না, ওর কথা মনে করেই কাঁদি আমি। প্রতিদিন দেখতাম একটাই, মানুষটা আমার পাশে ঘুমায়ে আছে। সকালে ঘুম থেকে জাগলে রওনক আমার সামনে, বিকেলে কাজ থেকে ফিরলে রওনক, রাতে খেতে বসলে রওনক, ঘুমাতে গেলে পাশে রওনক। ওর শরীরের প্রতিটি বাঁক, ওর চলার, কথা বলার প্রতিটি স্পন্দন আমার চেনা হয়ে গেছে। ও একটা মানুষ। রান্নায় বলেন আর দাম্পত্যে বলেন ওর সৃজনশীলতার তুলনা নেই। তবু মনে হতো, রওনকের মধ্যে কোনো রহস্য নেই। আমাদের প্রতিদিনের যৌনতাও একটা রুটিন হয়ে গেছে ততদিনে। মাঝে মাঝে হয়তো এক মাস পনেরো দিন যৌনতার কথা ভুলে আছি। হঠাৎ

রওনক বলে, বিয়ের পর মানুষ কী করে? আমি আনমনে বলি, কী করে? রওনক হাসে, বলে তুমি দেখি সব ভুলে বসে আছো। আচ্ছা সত্যি করে বলো তো, আমাকে কি তোমার আর ভালো লাগে না? আমাকে কি তোমার সেক্সি মনে হয় না। তোমার কি মনে হয় নতুন কারো সঙ্গে প্রেম করলে তুমি ভালো থাকবা। জীবনে আনন্দ ফিরে পাবা? আমি বলি, কী বলো রওনক। তোমাকে ভালো লাগবে না কেন? ইউ আর দ্য বেস্ট। কিন্তু আর কতদিন। ছেলে বড় হয়েছে, বিদেশে পড়তে গেছে। কিছুদিন পর পাস করে ফিরে আসবে। আর কত বলো তো।

রওনক বলে, জীবনটাকে এনজয় করার চেষ্টা করো। ব্যবসায় মন দাও। রওনকের আগ্রহে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। সেকেন্ড ইনিংস। আমার পাজেরোটা দেখছেন? এটা দ্বিতীয় ইনিংসের ফল। আগে ছোট ৮০০ সিসির গাড়ি কেনার কথাও ভাবতে পারতাম না। রওনকের কথায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম। একটা বয়স থাকে, যখন মানুষ যা চায় তাই করতে পারে। আমার ফর্টি এইটে সেই বয়সটা এলো। খুব ভালো ব্যবসা হচ্ছে এখন। আমি তো শেষ হয়েই গিয়েছিলাম। ছেলে ইউকে থেকে উৎসাহ দিত। বুঝলেন, তারুণ্য একটা ঘটনা। মরা মানুষকেও জ্যান্ত করে তুলতে পারে। এ কারণেই তরুণদের সঙ্গে আমি মিশি। তাদের জীবনী শক্তি শুষে নেই। গিরগিটি দেখেছেন? এই প্রাণী নাকি দূর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে। আমি তরুণদের সঙ্গে মিশে তাদের চিন্তা, উদ্দীপনা টেনে নেই। তাদের বোঝার চেষ্টা করি, নিজেকে সাজাই।

আমার ফেসবুকে আসার ঘটনাটাও অদ্ভুত। ছেলের সঙ্গে মেইল আদান-প্রদানের জন্য বাসায় ইন্টারনেট নিয়েছিলাম। ছেলে ওর মাকে ফেসবুকে নিয়ে এলো। রওনক ধরে বেঁধে আমাকে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলালো। প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেল। তারুণ্যের বিশাল এই বাজারে এসে আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। পরিচিত মানুষ অনেক। তাদের সূত্র ধরে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গেও সখ্য হলো। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে দেখা হলো। তবে একটা কথা বলি, আপনার বয়স তো খুব কম। বয়স যখন বাড়বে তখন হয়তো এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারবেন। নেভার মিট ওল্ড ফ্রেন্ডস। পুরনো বন্ধুদের থেকে সাবধান। আপনি একেবারে হতাশ হয়ে যাবেন। দুই পুরনো বন্ধুর দেখা হলে সবচেয়ে বেশি কী ঘটে বলেন তো? স্মৃতিচারণ। স্মৃতিচারণ খুব খারাপ জিনিস। স্মৃতি অতীতের কদর্য একটা ঘটনাকেও অনেক মধুর করে দেয়। স্মৃতি বাস্তবতা থেকে দূরে নিয়ে যায়। এজন্য অ্যাকটিভ মানুষের জন্য এটা খুব খারাপ উপাদান। উদ্দীপনা নষ্ট করে দেয়।

সবচেয়ে অবাক হই যখন কোনো তরুণী আমাকে অ্যাড করে। অসংকোচে তুমি বলে ডাকে। আমি তাদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করি। ওরা কিভাবে কথা বলে রপ্ত করার চেষ্টা করি। কমিউনিকেশন হয়। দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকে। আমি বুঝতে পারি, আরেকটা নতুন সময়ের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়ে গেছে। তারুণ্য খুব মজার জিনিস। আপনাকে সে-ই নিজের দরকারে যুবকের মতো সাহসী করে তুলবে। আপনি রিস্ক নিতে থাকবেন। আপনি দেখবেন নতুন দুয়ার খুলে গেছে।

লাস্ট উইকে একজনকে নিয়ে যমুনা দেখে এলাম। ভরা বর্ষায় প্রমত্তা যমুনা। ঢেউ দেখেন, পানির থিকনেস দেখেন– অবাক হয়ে যাবেন। পানির রঙ দেখবেন খেয়াল করে। কোথাও ঘোলা কোথাও স্বচ্ছ কোথাও শান্ত কোথাও তীব্র। রঙহীন এক পানিরই কত রঙ।

আমি একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি?

করেন না। আপনার কাছে রাখঢাক কিসের?

এইসব ভাবী জানে?

জানবে না কেন? শোনেন, যখন প্রথম প্রথম চ্যাট করতাম ও আমার পাশে বসত। তরুণীদের সঙ্গে আলাপের সময় বলত, এটা বলো। এটা বললে পটে যাবে। বলত ডোমইন্নোতে খেতে ডাকো। পিজা হাটে দাওয়াত দাও। আমি বলতাম, এইসব কী বলো রওনক, আমি তো ফতুর হয়ে যাব। রওনক বলত, না খাওয়ালে এখন কিছু হয়? একটা কথা মনে রেখো খাওয়াতে পারবে, দেখা করতে পারবে কিন্তু কী হলো সব আমাকে এসে বলতে হবে। আমি যদি বুঝি তুমি লুকাচ্ছো তাহলে কিন্তু আর অনুমতি পাবে না।

আপনি বলেন?

সব তো আর বলা যায় না। তবে কিছু কিছু বলি। আমার হাসি দেখে বলে, তুমি মনে হয় এগিয়েছো কিছুদূর। শোনো, বেশি এগিয়ো না। এইটুকু বলে রওনক থেমে যায়। কারণ আমার দ্বিতীয় ইনিংসে সেও খুশি। আমাদের সম্পর্কেও নতুন উদ্দীপনা এসেছে।

কিন্তু আপনি তো প্রতারণা করছেন ভাবীর সঙ্গে। ধরুন, উনিও যদি আপনার মতো কারো সঙ্গে ডেট করতে যায়। আউটিংয়ে যায়। আপনি তাকে অ্যালাউ করবেন?

নওরোজ ভাই একটু ঝিম মেরে থাকে। বলে, যুক্তির খাতিরে বললে অবশ্য মেনে নিতে হয়। কিন্তু প্রাকটিক্যালি বললে, শি হ্যাজ নট এনাফ অপরচুনিটিস টু গো আউট ফর দিস অর দ্যাট।

কিন্তু ধরেন একদিন জানতে পারলেন, ওনার এক্সট্রাম্যারিটাল কিছু আছে। আপনি ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবেন?

দেখেন মি. শুভ। এখানে দেয়া-নেয়ার কিছু নেই। উই অল আর ফ্রি পিপল। সো এভরিওয়ান হ্যাজ হিজ অর হার রাইট, যার যা খুশি রাস্তা বেছে নিতে পারে।

নওরোজ ভাই একটু বিষণ্ন হয়ে ওঠে কথা বলতে বলতে। বলে আসেন একদিন বাসায়। রওনককে আপনার কথা বলেছি। সেও আপনার ভক্ত হয়ে গেছে।

অবাক ব্যাপার তো নওরোজ ভাই। আমার ভক্ত হবে কেন? আমার কী এমন গুণের কথা ওনাকে বলেছেন যে উনি ভক্ত হয়ে গেলেন?

আপনি জেন্টেলম্যান। আপনার স্টেটাসগুলো মাঝে মাঝে রওনককে দেখাই। বলি, দেখো কী ব্রিলিয়ান্ট। রওনক আপনার স্টেটাস পড়ে মজা পায়। আপনি খুব উইটি। চারদিকে সব সিরিয়াস মানুষ না? সিরিয়াস মানুষগুলো একটা কথা কিছুতেই বোঝে না যে, সিরিয়াসনেস একটা বোরিং ব্যাপার। বুঝছেন? রওনক কী বলে জানেন,

বলে শুভ ভাইকে একদিন ডাকো। ওনার কাছ থেকে শাং-রি-লার গল্প শুনব। জেন শিখব। অনলাইনে জেন নিয়ে কিছু পাওয়া যায় নাকি? আপনি আমাকে কিছু লিঙ্ক দিয়েন তো। রওনক বলে, জেনটা শেখা দরকার।

মাঝে স্টেটাসে কিছু স্প্রিচুয়াল কথাবার্তা লিখেছিলাম। জেন, শাং-রি-লা এসব নিয়ে। হতে পারে এগুলোই নওরোজ-রওনক দম্পতির আগ্রহ তৈরি করেছে।

একবার চ্যাটে জেন নিয়ে কিছু বলেছিলাম নওরোজ ভাইকে। জেন সাধুর কাছে শোনা কিছু কথা।

জেন নিয়ে আমার আগ্রহের পেছনে ওই জেন সাধু। ফেসবুকে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ফ্রেন্ড লিস্টে জেন সাধুকে অ্যাড করে তাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম।

হোয়াট ইজ জেন?

দু'দিন পর সাধুর উত্তর এলো।

জেন ইজ এভরিথিং। জেন ইজ আ লিভিং প্যাটার্ন। ইটস এ আর্ট অফ লিভিং।

ইজ ইট পসিবল টু লার্ন জেন?

ইয়েস, ইট ইজ। প্লিজ বি উইথ এ সাধু।

ফেসবুকে ওই সাধুর সঙ্গে কথা হতো নিয়মিত। তিনি গল্পের মাধ্যমে আমাকে জেন শেখাতেন। জেন হলো গতিপ্রকৃতির বিজ্ঞান। অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষাকে সূত্রে পরিণত করা। ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করার এক আদর্শ বিদ্যা। সাধু আমাকে অনেক গল্প বললেন, আরও অনেক গল্পের খোঁজ দিলেন। বেশ কিছু সাইট খুঁজে পেলাম জেন বিষয়ে। তারপর একদিন সাধু নিজেই ফেসবুক থেকে হাওয়া হয়ে গেলেন। একদিন আমার মনে একটা প্রশ্ন এলো। আমি সাধুকে মেসেজ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। জিজ্ঞেস করতে চাইছি, এক সঙ্গে দু'জন মানুষের সঙ্গে প্রেম করাটাকে জেন কীভাবে দেখে। দেখি আমার লিস্টে সাধু নেই। ফেসবুকে সার্চ দিলাম। অনেক খুঁজেও আর সাধুর সন্ধান মিলল না। এরপর আমি সাধুকে প্রোফাইলে প্রোফাইলে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে আজিজ মার্কেট থেকে জেন বিষয়ক বইগুলো কিনে নিয়ে এসে জেন চর্চা শুরু করি।

সাধু আমাকে শাং-রি-লার কথা বলেছিলেন।

শাং-রি-লা কী?

আ ওয়ার্ল্ড অব ডিভাইন ফ্রিডম।

মৃত্যুর ওপারে?

না। এটা এই জগতেরই বিষয়। এমন এক দেশ আছে। হয়তো তিব্বতে, হয়তো চীনে, ভুটান, থাইল্যান্ড এমন কোনো স্থানে যেখানে আছে চির শান্তির সন্ধান। যেখানে মানুষের বয়স বাড়ে না। যেখানে মানুষের দুঃখ নেই। যেখানে মানুষ প্রকৃতির সন্তান। একটি গাছের মতোই তার জীবন সরল ও সুন্দর।

আপনি কি গেছেন সেখানে?

না। আমি যাব। জেন প্রচার করতে করতে সাধুদের সঙ্গে আমি পাহাড়ের ওপারে সেই দেশে যাব।

হয়তো জেন সাধু পাহাড়ের ওপারে শাং-রি-লার সন্ধানে বের হয়েছেন।

একদিন আমি স্টেটাসে লিখে রাখলাম, 'তোমার আত্মাকে এমনভাবে মান্য করো যেন তিনিই তোমার গুরু।' স্টেটাসটা দেখে নওরোজ ভাই চেপে ধরলেন। বললেন, এটা কী?

আমি সাধুর কথাগুলো বললাম তাকে।

একবার সাধু দূর দেশে যাচ্ছেন। একজন শিষ্য বিদায় জানাতে এলো। নৌকায় সাধু উঠতে যাবেন। শিষ্য বলল, আপনি আমার পথপ্রদর্শক। আমি যা ভালো করি আপনি তা প্রশংসা করেন। আমি যা মন্দ করি আপনি তা ভর্ৎসনা করেন। আপনি যেন আমার আয়না। আপনি এমনকি কিছু না বললেও আপনার মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি আমার কী করণীয়। আপনার অনুপস্থিতি আমার কাছে অন্ধত্বের শামিল।

সাধু বললেন, আজ থেকে তুমি আত্মার কথা শোনো। তোমার আত্মাকে এমনভাবে মান্য করো যেন তিনিই তোমার গুরু।

নওরোজ ভাই বললেন, আমাকেও জেন শেখান। আপনি আমার গুরু।

কী বলেন নওরোজ ভাই! আমি কি গুরু হতে পারি নাকি। যিনি সব জানেন তিনিই গুরু। আমি তো কিছুই জানি না।

তাহলে উপায়?

নওরোজ ভাই, তাহলে এক কাজ করি। জেন নিয়ে যত বই পাওয়া যায় সেইগুলা আমি কালেক্ট করে একদিন আমি আপনার অফিসে আসি। কী বলেন?

আপনি এত শাই কেন রে ভাই? অফিসে আসবেন কেন বলেন তো? যে কোনো দিন সোজা বাসায় চলে আসেন। এনিটাইম।

একদিন যাবো কি-না তার বাসায় ভাবি। সত্যি কথা বলতে কি, নওরোজ ভাইয়ের চেয়ে রওনক ভাবীর কথাই বেশি মনে পড়ে। দেখতে কেমন হতে পারেন, কেমন স্মিত, শান্ত আর উদার হতে পারেন ভাবি। একদিন যাব। তবে সবার আগে জরুরি হলো, নওরোজের কথামতো তিন্নির ব্যাপারটা চিন্তা করা। তিন্নি যদি ভেবে থাকে আমাকে সে প্রহরীর ভূমিকায় দেখবে চিরদিন, তাহলে তো সেটা বিরাট ভুল। আর এ কথাটা ওকে জানানো দরকার। সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনো অবমাননার ব্যাপার সুপ্তভাবে থাকলেও একে আর বন্ধুত্ব বলা যায় না। বিশেষ করে সুপর্ণার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, ওর বাসায় গিয়ে ওর বাবাকে নালিশ জানিয়ে সুপর্ণাকে চাপের মধ্যে ফেলার ঘটনাগুলো তিন্নি সম্পর্কে আমাকে নতুন করে ভাবাচ্ছে। মেয়েটা হয়তো অসুস্থ অথবা অসূয়াগ্রস্ত। আমার কি উচিত মেন্টাল রিকভারির জন্য ওকে হেল্প করা?

সুপর্ণার সঙ্গে দুই মাস দেখা হয় না। একদম দেখাই হয় না। দেখা হওয়ার একটা অদ্ভুত গণিত আছে। যার সঙ্গে দেখা হবে কেন যেন তার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হবেই। রাস্তায় জ্যামে আটকালে দেখা গেল বাসে করে চলে যাচ্ছে। ডাবল ডেকারে করে আসছি তো দেখব কোনো স্টপেজে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মাস দুয়েক আগেও সুপর্ণার সঙ্গে কত জায়গায় দেখা হতো। আমি জানতাম কোথায় কোথায় সে যায়। কোথায় বাজার করে। দেখা হয়ে যেত কীভাবে যেন। এখন একদম দেখা হয় না। কত

দিন। দুই মাস। আর কখনো দেখা হবে না, হয়তো। আর এজন্য দায়ী একজনই। তীব্র একটা অসন্তোষ নিয়ে আমি তিন্নিকে ফোন দেই।

তিন্নি ফিসফাঁস করে কথা বলে, বন্ধু এত রাতে আমার কথা মনে হইলো তোমার? কী কারণ? ঘুম আসে না?

তোমার কথা ভাবতেছি।

কী ভাবো? ইন্টারেস্টিং। বল তো দেখি কী ভাবলি?

আচ্ছা তিন্নি, সিরিয়াস কথা। তুমি তো সুন্দর মেয়ে তাই না? ফিগার ভালো। লম্বা-চওড়া। তুমি প্রেম করো না কেন? বিয়ে করো না কেন? কোনো সম্পর্ক নাই কেন তোমার?

কী কইলি, আমি সুন্দর। ফিগার দেখছিস আমার?

দেখব না কেন? তোর স্তন অনেক সুন্দর। আর বডি স্ট্র্যাকচারও ভালো।

কেমনে বুঝলি?

তুই তো ঢেকে রাখার চেষ্টা করিস না। তাই না? শুধু আমি না। সবাই বোঝে। ওকে, শোন, তোর প্রশংসা করার জন্য ফোন দেই নাই। আমার প্রশ্নের সাফ সাফ জবাব দিবি। লেট মি নো, কারো সঙ্গে তোর কোনো সম্পর্ক হইলো না কেন?

কার সঙ্গে সম্পর্ক করব? তোর সঙ্গে? নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখিস। হোঁদল কুতকুত চিনিস? তোর চেহারাটা হোদল কুতকুতের মতো। কিন্তু একটা জিনিস জানিস? আমির খান বাইরে থেকে দেখতে যেমন তোর মনটা সেই রকম। এই জন্যই তোর লগে মিশি।

আমার সঙ্গে মিশতে হবে না। সিরিয়াসলি বল। যা জিগাইছি উত্তর দে।

অকে। ফ্রেন্ড। শোন। তুই তো তারেক, আফিফ আর ফারুকের কথা জানিস। তুই বল তো এ ধরনের কোনো পোলার সঙ্গে আমার মিলবে? দেখতে-শুনতে ভালো। দ্যাটস অল। কিন্তু দে আর নট মাই টাইপ।

তোর টাইপ কেমন? তোর সঙ্গে মিলবে এমন লোক কই পাওয়া যাবে?

কই পাওয়া যাবে মানে? এখন কী আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া আমার টাইপের লোক খুঁজব। শোন, আমি তোরে একটা সত্যি কথা বলি। আমার কথা ভাইবা রাইতের বেলা ফোন দিছস। খুব খুশি হইছি। তথ্যটা জেনে তুইও নিশ্চয়ই খুব খুশি হবি। তোর সঙ্গে আমার টাইপের ৫ শতাংশ মিল আছে।

থ্যাংকস। যদিও আমি এইটা বিশবাস করলাম না। এখন বল, লঙ টার্ম থাকার জন্য না হয় তোর কাউরে পছন্দ না। কিন্তু শর্ট টার্মের জন্যও কাউরে ভালো লাগে না? এনজয় করলি। সেক্স করলি। ডেটিং হইলো। মৌজমাস্তি হইলো। হয় না এ রকম? এ রকম করলে তোর সমস্যা কোথায়?

আচ্ছা তুই কী বল তো। তুই না আমাকে ভালোবাসিস? একপাক্ষিকভাবে হইলেও তো ভালোবাসিস তাই না? তুই এইটা কইতে পারলি? আমি কারো সঙ্গে শুইলে তুই জেলাস হবি না? তুই কি মহাপুরুষ না কাপুরুষ?

তিন্নি তোরে সত্যি করে একটা কথা বলি। সুপর্ণার সঙ্গে কিছুদিন কথা বলে, মিশে আমার ধারণা হইছে চিরদিন আমি তোর বন্ধু থাকতে পারব না। কারণ তোর বাইরে অন্য মেয়েরা আমাকে তীব্র আকর্ষণ করে। ইউ নো দ্যাট। কিন্তু আমি জানি তখন তোর খুব কষ্ট হবে। আর তুই হয়তো বিয়েও করতে পারবি না এই জীবনে। কিন্তু অ্যাট লিস্ট কিছু নতুন বন্ধু হোক। আমি একটা জিনিশ বুঝি না, তোর মতো জলি একটা মেয়ে। এত স্বতঃস্ফূর্ত, এত সুন্দর করে কথা বলিস। তোর কোনো ছেলে বন্ধু নেই। আমি চিন্তা করতে পারি না।

খুবই চিন্তার কথা। এখন বল আমাকে কী করতে হবে?

একটা বন্ধু জোগাড় কর। কলিগ, পুরনো ক্লাসমেট, ফেসবুক ফ্রেন্ড, মোবাইল নেটওয়ার্ক, আত্মীয়স্বজন যেখান থেকে পারিস একটা বন্ধু জোগাড় কর।

ঠিক আছে। আমি ভাবব তোর কথা।

একদিন বড় মূর্খ হবো

আপনি কি জানেন ডোরিস লেসিং একজন সুফি?

সাবিনা মেহনাজ লেখে, লোল। আ সুফি ডাজন্ট কল হারসেলফ টু বি আ সুফি।

ঠিক তাই, ডোরিস লেসিংও ঠিক একই উত্তর দিয়েছিলেন তার ইন্টারভিউতে।

দেন শি ইজ ওকে। একজন সুফি কখনোই নিজেকে সুফি হিসেবে দাবি করবেন না।

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তির সঙ্গে আলাপ ফেসবুকে। ফ্রেন্ড সাজেশনে প্রতিদিন সুপ্তির নামটা আসত। সঙ্গে মেসেজ সুপ্তি আর ইউ হ্যাভ ৩৭ কমন ফ্রেন্ডস। শ্যামলা মোটা চেহারার সুপ্তির প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিনি অনেক দিন। হঠাৎ একদিন দেখি ইনবক্স খালি। জন্মদিনে কাউকে শুভেচ্ছা জানানোর নেই। প্রোফাইলে প্রোফাইলে ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছা করছিল না একদম। অনলাইনে তেমন কেউ নেই। মনে হচ্ছিল ফেসবুকের চার্ম শেষ হয়ে এলো। এ রকম হয়। টেকনোলজির একটা শেষ আছে। টেকনোলজি কখনো মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। মাইস্পেস, হাই ফাইভের মতো ফেসবুকের মজাও একদিন শেষ হয়ে যাবে। এটা জানা ছিল। কিন্তু এত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে ভাবিনি। মাঝে মাঝে ভাবি, ইন্টারনেটে বসে কিছু পড়াশোনা করলেও তো পারি। ইমিডিয়েট দরকার ছাড়া কোনো তথ্য জানতে ইচ্ছা করে না। এ রকম একটা ইউজলেস সময়ে হোম পেজে সাবিনা মেহনাজ সুপ্তির সাজেশন। রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে বসে থাকলাম। উনি অনলাইনেই ছিলেন। উইদিন আ মিনিট রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে অনলাইনে দেখা দিলেন। নক করলাম, হাই! সেই শুরু। বিবাহিত, চল্লিশোর্ধ্ব নারী। জিজ্ঞেস করলেন, ডু ইউ নো দ্য মিনিং অব লাইফ?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাধারণ চেহারার একজন মানুষ। একেবারে সাদামাটা প্রোফাইল, তার কাছ থেকে এমন প্রশ্ন এক্সপেক্ট করিনি।

বললাম, আই ডোন্ট নো।

হাউ ডু ইউ ফিল লিভিং দিস লাইফ?

আই ফিল নাথিং। লাইফ ইজ এ ডেইলি রুটিন টু মি। আ অ্যাম এ প্রিজনার অব ডেইলি লাইফ।

উনি আমার দিন, সপ্তাহ মাসের ফিরিস্তি শোনেন। বলেন, কেন আপনার মনে হয় আপনি স্বাধীন নন।

আমি এই রুটিন থেকে বের হতে পারি না। জীবনের কোনো অর্থ আমার কাছে নেই। বহুদিন কোনো গভীর ঘটনা আমাকে নাড়া দেয় না। আমার জীবন পুরোপুরি ননহ্যাপেনিং। কোনো সংবাদ আমাকে আলোড়িত করে না। অফিসে যাই, অফিস থেকে বেরিয়ে আসি। একটু ঘুরেফিরে বাসায় ফিরে আসি। মাসে দু'মাসে বেড়াতে যাই বন্ধুদের সঙ্গে। দু'বছরে একবার ইন্ডিয়া বা নেপাল ট্যুর। এই তো। একঘেয়ে রুটিন কি ভালো লাগে?

সাবিনা বলেন, আপনি তাহলে আর সবার মতো নন। অর্ডিনারি মানুষ পুরো জীবনটা একইভাবে পার করে দেয়। এমনকি তার মনে প্রশ্নও জাগে না যে, কীভাবে জীবনটা সে পার করে দিচ্ছে। আপনার মতো ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞেস করুন। তারা আলাদা করে এ প্রশ্নটা বুঝতে পারবে না। আপনার মনে প্রশ্নটা জেগেছে আর নিজে থেকেই আপনার মন একটা সমাধান খুঁজছে। আপনি হয়তো জানেনই না যে মন নিজের উদ্যোগে সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড আউট দি পাথ টু গেট আউট ফ্রাম ইট। আপনি জানেন, এই বয়সেই গৌতম বাড়ি ছেড়েছিলেন। তিনি দুঃখের কারণ খুঁজেছিলেন। সাবিনা বলেন, আপনি কি জানেন মোক্ষ কী?

না।

আপনি কি জানেন মোক্ষ আর মুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

না।

আপনি কি জানেন, এই রুটিন বাঁধা জীবন থেকে মুক্তি সম্ভব নয়?

না।

কিন্তু মোক্ষ সম্ভব। ডোন্ট ট্রাই টু গেট আউট, স্টে হিয়ার। এ জীবন কি সুন্দর নয়? রাস্তার ভিড়, জ্যাম, জীবনযাপনের জন্য মানুষের পরিশ্রম, তার ঘর্মাক্ত মুখ কি সুন্দর নয়? পৃথিবীকে এসবই তো টিকিয়ে রাখছে। শত শত মানুষের বাঁচাকে সম্ভব করে তুলছে এই রুটিনই তো। আপনি এর থেকে মুক্তি নিয়ে কোথায় যাবেন? সেটা কি সম্ভব? আপনি বরং মোক্ষ খোঁজেন। যা এই বদ্ধ অবস্থাতেও আপনার আত্মার প্রশান্তি এনে দেবে। ইউ শুড ট্রাই টু ফ্রি ইউর সোল ফার্স্ট। দেন ইটস নো ম্যাটার হোয়েদার ইউ লিভ ইন আ জাঙ্গল অর ইন আ সিটি।

কথা শুনতে শুনতে আমি সাবিনা মেহনাজের প্রোফাইলে ঘুরি, তার অ্যালবাম দেখি। আকর্ষণ করার মতো কিছু নেই। অন্য সময় হলে তিনি নক করলেও হয়তো কথা বলতাম না। আজ একটা অবসন্ন দুপুরে তাকে তো একরকম আবিস্কার করলাম। দারুণ এক মানুষ। জাস্ট লাইক এ ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড। একদিন দু'দিন তিনদিন তার সঙ্গে আলাপ হতে থাকে। তিনি বলেন তার কাহিনী।

আমার চেহারা তো দেখেছেন। সত্যি বলতে স্বামীকে আকৃষ্ট করে রাখার কোনো গুণ তো আমার ছিল না। সন্তান নেই যে তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আমি আমার স্বামীকে বার বার জিজ্ঞেস করতাম, ডু ইউ লাভ মি? স্বামী বলত, ইয়েস আই ডু লাভ ইউ। আমার মনে হতো, এ তো জানা উত্তর। সে তোতাপাখির মতো করে উত্তর দেয় একইভাবে। মনে হতো যদি সে বলত, নো, আই ডোন্ট। তাহলে হয়তো বেশি খুশি

হতাম আমি। কিন্তু আমি আসলে কী শুনতে চাই আমি জানতাম না। আমার বাসায় একদিন এলে দেখবেন বারান্দায় কত বড় বাগান করেছি আমি। ফার্ন, ক্যাকটাস কত কত গাছ। একেকটা গাছ ১০-১২ বছর ধরে বড় করেছি আমি। দেন, একদিন ফুল আসে। নতুন পাতা আসে। নতুন গাছ হয় তার থেকে। সেটাকে আলাদা টবে লাগাই। গাছের সংখ্যা বাড়ে। হঠাৎ একটা গাছ শুকিয়ে যায়। আমি বুঝলাম, এটা অনেকটা সন্তান পালনের মতোই ব্যাপার। বারান্দার গাছগুলোর কাছে আমি জানতে পেরেছি, জীবনের অনন্ত চক্র কী। অর্থহীন এক অনন্ত চক্রের বন্দিত্ব থেকে তো আমার মুক্তি নেই, তাই না? আমার স্বামী আমার জন্য কী করতে পারে? বড় জোর আমি জিজ্ঞেস না করতেই বলতে পারে, আই লাভ ইউ। তাতে কী? সে তো কতবার বলেছে। বিশবাস করে বলেছে, রুটিন করে বলেছে। কখনো স্রেফ খুশি করার জন্যও হয়তো বলেছে। এতে কী আসে-যায়? প্রশ্ন হলো, দু'জন মানুষের পাশাপাশি থাকার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে। মেনে নেয়ার, মানিয়ে নেয়ার, আপস করার, ডেইলি রুটিনের কদর্যতা আছে। আপনি বাথরুমে যাচ্ছেন, কাপড় বদলাচ্ছেন, গপ গপ করে খাবার গিলছেন। আরও কত কী হচ্ছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে আপনার মধ্যে ভালোবাসা যে জাগতে পারছে সেটা এক দুর্লভ বস্তু।

তো শোনেন, আমি কীভাবে জানলাম, মোক্ষ সম্পর্কে। সাদিকের সঙ্গে একদিন দেখা। আমার বন্ধু। এক সঙ্গে পড়তাম। ক্যাম্পাসে থাকতে কবিতা লিখত। ওর সঙ্গে একদিন ফার্মগেটে দেখা। হাতে একটা বই। নির্মেদ চেহারা এখনও, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা মুখ। প্রথমে চিনতেই পারিনি। ও এগিয়ে এসে বলল, কেমন আছো? চিনলাম, একসঙ্গে চা খেলাম রাস্তার পাশের দোকানে। আমি যাই যাই করছি দেখে ও বলল তোমার কাছে কিছু টাকা হবে? ধরো পাঁচশো। কী করবে। তুমি তো জানো, আমি নেশা করি। নেশা করব। আমি হেসে ফেললাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। বললাম, এক হাজার রাখো। পার্স খুলে টাকা বের করে দিলাম। ও বলল, কেউ কিন্তু নেশা করার কথা বললে উৎসাহিত হয়ে দ্বিগুণ টাকা দিয়ে ফেলে না। আমি বললাম, আমি বললেই কি তুমি ছেড়ে দেবে? এতদিনে যখন ছাড়তে পারোনি তখন বলে কোনো লাভ আছে? সাদিক বলল, তার মানে তুমি যথেষ্ট সম্মান করে টাকাটা আমাকে দিচ্ছো, তাই না? তাহলে তোমাকেও আমার কিছু দেয়ার থাকবে। সঙ্গের ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে হাতে দিল। বলল, তুমি যদি কোনো অনুসন্ধানে থাকো তবে হয়তো এটা তোমাকে হেল্প করবে। বাই। বলে সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে বইটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কনফারেন্স অব বার্ডস।

আপনি কি ফরিদউদ্দিন আক্তারকে চেনেন?

আমি বললাম, না।

সাবিনা বলেন, একদিন হুপি পাখিদের মধ্যে আলাপ হলো। তারা পরিকল্পনা করল, তাদের সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বের করবে। নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে তারা একদিন উপস্থিত হলো এক সরোবরের তীরে। গিয়ে খুঁজে পেল তাকে। দেখল দ্য ক্রিয়েটর ইজ জাস্ট লাইক দেম। আমি বললাম, বলেন কী? সাবিনা বললেন, এর মানে

কী? মানে হলো, আপনি, আপনার ভেতরেই তিনি। তিনি নিজের রূপেই আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে, আপনাকে কেন্দ্র করে যে জগৎ, সে তারই জগৎ। কিন্তু এটা খুব গোপন একটা কথা। আর মূল সত্যটা এ কথার মধ্যে নেই। অনুসন্ধান হলো সবচেয়ে বড় সত্য। নিজের মতো করে খুঁজতে না থাকলে উপলব্ধি আসবে না। আপনি যা খুঁজে পেলেন তা মুখ্য নয়, আপনি কীভাবে খুঁজে পেলেন সেটাই মুখ্য। কেন জানি আমার মনে হয়, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের পথ অনুসরণ করে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করতে পারে না। ডু দি অ্যান্ড দ্যাট, ফলো হিম এসব দিয়ে আসলে হয় না জানেন। এগুলো কিছু তথ্য হিসেবে থাকে। একটা নিউজ জাস্ট। আফগানিস্তানে একটা বোমা বিস্ফোরণের খবরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না অনেক সময়। আর যদি আপনি খুঁজতে থাকেন এবং নিজে একদিন আবিস্কার করেন তাহলে অনুভব করবেন, হোয়াটস কল ট্রুথ। কেন মানুষ বছরের পর বছর ধরে এই সত্যের সন্ধানে নেশাগ্রস্তের মতো লেগে থাকে।

ডা ভিনিচি কোড পড়েছেন বা দেখেছেন?

হ্যাঁ।

হন্যে হয়ে যে খুঁজছিল– হোলি ব্ল্যাড লাইন। সে একদিন হঠাৎ আবিস্কার করল, ইটস শি। তার মধ্যেই সেই পবিত্র রক্তপ্রবাহ। এমনকি এটা আপনি-আমিও হতে পারি। কিন্তু আবিস্কার করতে পারলেই সেই উপলব্ধি আসবে। পুরো নামটা লিখি আমি :

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তি।

কী।

আর ইউ এ বিলিভার?

নো আই আম অ্যান এথেইস্ট।

ডু ইউ বিলিভ দেয়ার একজিস্টস আ সোল ইন হিউম্যান বডি?

আপনি কি অনুভব করেন? আপনি কি মনে করেন, আপনি দুঃখিত? আপনি কি বেদনাবোধ করেন?

হ্যাঁ।

এই অনুভবই আপনার আত্মা। যে অনুভব করে সেই আত্মা।

আর ইউ আ সুফি?

আ সুফি ডাজন্ট ক্লেইম হারসেল্ফ টু বি আর সুফি।

আপনি কি মোক্ষ অর্জন করেছেন?

এটা অর্জন করা যায় না। অনুসন্ধান করতে হয়।

কতদিন?

সাবিনা মেহনাজ হাসে। লেখে, লোল।

ফেসবুকে একটার পর একটা মুখ দেখি প্রতিদিন। শত শত হাজার হাজার মুখের মধ্য দিয়ে একটা এন্ডলেস জার্নি। এত মানুষ এবং তাদের এত আলাদা মুখ। পাঠক

যেভাবে পাতার পর পাতা উল্টিয়ে একটি বই পড়ে, তেমনি মুখের পর মুখ উল্টিয়ে আমি পরিভ্রমণ করি ফেসবুক। আনিলার স্টেটাস মেসেজ ভালো লাগে। রূপার অ্যালবাম। রিনা কাওসারি ছেলে না মেয়ে এটা তদন্ত করার মজাই আলাদা। রিনা কাওসারির আবির্ভাবের পর সবাই রিনা কাওসারির ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাচ্ছে। একটা স্বচ্ছ শাড়িতে উন্নত স্তনের রিনা কাওসারির ছবিঅলা প্রোফাইল। এক ছবিতেই ফেসবুক কাত। দিনে দেড়শ' বন্ধু হচ্ছে তার। একদিন হারুণ অনলাইনে নক করে। বলে, রিনা কাওসারির রিকোয়েস্ট নিশ্চয়ই পেয়েছেন। পেলে অ্যাকসেপ্ট করবেন না। শোনেন, রিনা কাওসারি কিন্তু ছেলে। স্বচ্ছ শাড়িতে তার উঁচা বুক দেখে যেন ভুলবেন না। হারুণের নিষেধ শুনে আমি আর রিনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের জন্য অপেক্ষা করি না। নিজে থেকেই রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিই। একদিন বিকেলে রিনাকে অনলাইনে পেয়ে গেলে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি জানেন আপনাকে লোকে ছেলে বলে।

রিনা বলে, আমি সাহসী যে। নিজের ছবি এভাবে কেউ দেয় না। আমি দিয়েছি। এজন্যই কেউ বিশবাস করে না আমি মেয়ে। ছেলেগুলো খুব টিপিক্যাল চিন্তা করে। কেউ সাহসী হলে ধরেই নেয়, সে আসলে সে নয়, অন্য কেউ। নিশ্চয় কোনো ছেলে মেয়ের নাম নিয়ে মজা করছে, এটাই ভাবে।

বললাম, সাহসী যদি হবেনই তো একটা ছবি দিয়েছেন কেন? আর ছবি নেই?

রিনা কাওসারি বলে, শেষ পর্যন্ত আপনিও সন্দেহ করছেন। জানেন তো সন্দেহ হলেই লোকে আরও ছবি দিতে বলে। ফোন নাম্বার চায় অথবা ফোন করতে বলে। কিন্তু আমি যদি ছবি না দিতে চাই, ফোন না করতে চাই তাহলে কি আমি ছেলে হয়ে গেলাম। ছেলে হলেই বা ক্ষতি কী? আপনার কি মনে হয় আমি মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতেই উন্মুখ? আপনি ছেলে ভাবলেও তো সমস্যা নেই তাই না। এক কাজ করুন ছেলে হিসেবেই আমার সঙ্গে কথা বলুন।

কিন্তু ধরুন, আপনাকে ছেলে ভেবে নিলে তো আপনার সঙ্গে আমার কথার ধরন বদলে যাবে। ভাষা বদলে যাবে। সেটা কি আপনার ভালো লাগবে?

তাহলে আপনিই বলেন, আমি কীভাবে মেয়ে এই প্রমাণ দিতে পারি।

চেষ্টা করেন দেখি, পারেন কি-না।

আচ্ছা শোনেন, একটা কথা বললে আপনি বিশবাস করবেন? শোনেন আমার পিরিয়ড চলছে। একজন ছেলের নিশ্চয় পিরিয়ড হয় না। এখন আপনি কী বলবেন? একজন মেয়ে কি বলবে আমার পিরিয়ড চলছে?

ওকে আপনি তো বললেনই যে, আপনি যথেষ্ট সাহসী। আমি বিশবাস করলাম। হ্যাভ আ হ্যাপি পিরিয়ড।

রিনা কাওসারি বলে, পিরিয়ড হলে কেমন লাগে আপনি জানেন? আমি কীভাবে জানব, আমি তো কখনোই এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়িনি।

তাহলে শুনে রাখেন। রক্তনালিগুলো ব্যথা করে। আর রক্ত যখন শরীর থেকে বের হয়ে আসে তখন মনে হয় অস্তিত্বের একটা অংশ বের হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা

ফোঁটা রক্তের ক্ষরণ আমি অনুভব করতে পারি। রিনা কাওসারির অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমি টাসকি খেয়ে গেলাম।

বললাম, আপনি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা আমাকে কেন বলছেন।

রিনা বলল, শোনেন একটা আড়াল আপনার আর আমার মধ্যে আছে, তাই না? এই আড়ালটা যদি না থাকত তবে আমি কথাগুলো বলতে পারতাম না। আপনি রিয়েল ক্যারেকটার। আপনার স্টেটাস, পার্সোনাল ইনফরমেশন থেকে বুঝতে পারছি আপনি রিয়েল ক্যারেক্টার। আপনি পুরুষ। আমি নারী। হয়তো আপনার পরিচিত, হয়তো অপরিচিত। হয়তো আমার এ ছবিটা নকল। কিন্তু এই আড়ালটুকু না থাকলে আমি আপনাকে আমার পিরিয়ডের গল্পটা কিন্তু বলতে পারতাম না। এমন অনেক কিছুই তো হয়। আপনি আমাকে একজন নারীই ভাবুন না কেন। ক্ষতি কী? ডু ইউ বিলিভ মি?

আমি বললাম, হয়তো আপনি আমার কোনো ছেলে বন্ধুই। বিবাহিত বলে আপনি জানেন, পিরিয়ডের সময় মেয়েদের কেমন অভিজ্ঞতা হয়। তাই না? হতে তো পারে।

রিনা হাসে। হা হা হা করে হেসে বলে, ওকে ইয়াং ম্যান ক্যাচ ইউ লেটার। আই উইল লেট লেট ইউ নো ...।

কী?

রিনা কাওসারি অফলাইন হয়ে যায়। সুপর্ণা বা তিন্নি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, আসলে পিরিয়ডের সময় মেয়েদের কেমন লাগে। পিরিয়ডের সময় ছেলেরা নাকি অদ্ভুত এক নীরবতা আর শত প্রশ্ন নিয়ে সঙ্গীনীকে পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু কখনো জানতে চায় না, মেয়েটির কেমন লাগে। কেন তার শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকে।

রিনা কাওসারি চলে গেলে আমি প্রতিদিনের অভ্যাস মতো আনিলার প্রোফাইলে যাই। আনিলাকে ফেসবুকের অনেকে চেনে। আনিলা ফেসবুক সেলিব্রেটি। ওর ফ্রেন্ড লিস্টে আছে ৪,৪৬৭ জন মানুষ। আনিলা স্টেটাস আপডেট সিনড্রোমে আক্রান্ত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মজার সব স্টেটাস দিয়ে ভক্তদের তাক লাগিয়ে দেয়। আনিলার এফবি ফ্রেন্ড মুন্না আমাকে একদিন নক করে বলে, শুভ ভাই আপনেরে ভালা পাই।

আমি বলি, তো আমাকে কী করা লাগবে।

আমরা একটা গ্রুপ খুলছি সেইটাতে যোগ দেন।

গ্রুপের লিঙ্ক দেয় মুন্না। গ্রুপের নাম লাভার্স অফ সেক্সি আনিলা।

আনিলাটা কে?

আমাদের পাড়ার সুন্দরী। ও লেভেলের ছাত্রী। দেখতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো।

মুন্না তোমরা কি এইটা ভালো করলা। নিশ্চয় পাপারাজ্জি কইরা আনিলার ছবি তুইলা ফেসবুকে দিছো।

আপনে অনেক পিছায়া আছেন শুভ ভাইয়া। এই গ্রুপ আনিলা নিজে অপারেট করে।

মিথ্যা কথা।

আপনি তাইলে নিজে আনিলারে অ্যাড করে তারেই জিগান। এমনিতে সে কারো মেসেজের উত্তর দেয় না, বাট আমি তারে বইলা দেব যেন আপনার একটা মেসেজের উত্তর দেয়। আমি আনিলাকে অ্যাড না করেই ম্যাসেজ পাঠাই। ডু ইউ অপারেট দ্য গ্রুপ নেমড লাভার্স অফ সেক্সি আনিলা।

আনিলার উত্তর আসে তিনদিন পর। বলে, ইয়েস আই ডু। আই লাইক টু বি সেলিব্রেটেড। আমার মাথা একটু ঘুরে যায়। আনিলার ছবির নিচে ভক্তরা সেক্সি, সেন্সুয়াস, কুল, হট এমন নানা বাণী লেখে। আনিলা খুশি মনে ধন্যবাদ জানায়। একদিন মুন্নাকে পেয়ে আমি জিগাই, আচ্ছা মুন্না আনিলার আসল নাম কী? মুন্না বলে, আনিলা। আমি বলি ওর বাবা-মা ওকে বকে না। এমনে যে সেক্সি ছবি দেয় ফেসবুকে। নানা জন ওকে নিয়ে কমেন্ট করে। মুন্না বলে, ভাইয়া আপনেরে ভালা পাই। আমি বলি, মানে কী। বলে, আপনেরে বহুত ভালা পাই। এইগুলা আপনে বুঝবেন না।

আনিলার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি না। আজকে আনিলা লিখেছে, লিভ এ কিস বাট ইন দ্য কাপ। মোবাইল থেকে লেখা স্টেটাস। হয়তো এখন ক্লাস রুমে বসে ফেসবুক দেখছে। একটার পর একটা কমেন্ট পড়ছে। ইটস টু হট। সেক্সি। হোয়াই নট ইন ইওর লিপস। লোল। একটার পর একটা কমেন্ট।

শুভ ভাইয়া, আপনে কি জানেন আমাদের এক ফ্রেন্ড তার বেড সিন রেকর্ড করে আমাদের কাছে এমএমএস করছে। আপনি দেখতে চাইলে এখনই পাঠাই, আপনার নাম্বারটা দেন। আমি পাঠায়ে দিতেছি। অ্যান্ড ওই এমএমএস দেখে আমাদের আরেক বন্ধু মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছে। সে এখন ওর প্রেমে পাগল হয়ে ঢাকার রাস্তায় দিওয়ানা হয়ে ঘুরতেছে। আমি বললাম, বলো কি মুন্না। এটা হয় নাকি। মুন্না পাকনা ছেলে। বলে যুগ পাল্টাইছে না। যুগ কি আর আগের মতো আছে? আপনেরে ভালা পাই, শুভ ভাই।

মুন্না যে কেন আমারে ভালা পায় কে জানে। মুন্নার কথাবার্তা অল্প অল্প বোঝা যায়। কিন্তু মুন্না কেন আমারে ভালা পায় সেইটা বুঝি না। আমি একদিন ওরে জিগাই, আচ্ছা মুন্না তোমাদের যে বন্ধু তার বেড সিন রেকর্ড কইরা পাঠাইছে সেই গার্ল ফ্রেন্ড কি আনিলা নাকি? মুন্না বলে, আনিলা না। আনিলা তো স্টার। সামনের মাসে আনিলা ব্যান্ড দল নামাইতেছে। এখনই স্ক্যান্ডালে জড়াবে না। বাট দরকার হলে স্ক্যান্ডালও হবে। কী বলেন? আনিলার গান শুনছেন? শোনেন নাই? ওকে কয়দিন যাক, রাস্তাঘাটে এমনেই আনিলার গান বাজবে। আপনি নিজেই আইসা জিগাইবেন, মুন্না এই গানটা কার। আমি বলব, ক্যান এইটা তো আনিলার। এত কইরা কইলাম শুভ ভাই আনিলার গ্রুপে জয়েন করেন। আপনি অ্যাবিউসের দোহাই দিয়া কাটাইলেন। আপনেরে ভালা পাইতাম শুভ ভাই।

আনিলা ছাড়া প্রতিদিন একজনের প্রোফাইলে যাই আমি। রূপা। রূপাকে খুব চেনা চেনা লাগে। কোথায় যেন দেখছি। রূপা হলো দ্য গার্ল নেক্সট ডোর। পাশের বাড়ির মেয়ে। চিত্রাঙ্গদা সিংহ। হয়তো কোথাও দেখি নাই। কাউকে কাউকে দেখলেই মনে হয় না, কই জানি দেখছি, ওই রকম। তো রূপা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা অনলাইনে

থাকে। পড়ে না চাকরি করে কে জানে। সারাদিন অনলাইনে থাকলেও তাকে কখনো নক করা হয় না। রূপার প্রতিদিনের কাজ বলতে নিজের একগাদা ছবি আপলোড করা। হয়তো মডেলিং করে। নাকি ফ্যাশন ফটোগ্রাফির হাউসে কাজ করে। কিছুই বুঝি না। প্রতিদিন দেখি নিত্যনতুন পোশাকে রূপা হাজির। ছবিগুলো আনাড়ি হাতে তোলা না। ডেপথ ভালো, ফ্রেম ভালো, সেন্স ভালো। ভালো ফটোগ্রাফারের তোলা। হতে পারে, রূপা কোনো ফ্যাশন হাউসে কাজ করে। এমনও হতে পারে ফটোগ্রাফাররা তার বন্ধু। হতে পারে, রূপার প্রেমিক একজন ফটোগ্রাফার। প্রতিদিন ১০-১২টা ছবি দেয় সে। আমি সবগুলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। কখনো কমেন্ট করি না। রুপন্তী কীভাবে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে এলো আমি মনে করতে পারি না। কিন্তু আমরা কথা না বলে যোগাযোগ না করে চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকি। চিত্রাঙ্গদার মতো চেহারা। সেজেগুজে যেন জানালায় মুখ বাড়িয়ে বসে আছে কোনো পাড়ার সেরা সুন্দরী। পুরো দিনটা এভাবেই কাবার করে দিচ্ছে চিত্রাঙ্গদা সিংহ। কে জানে হয়তো আনিলার মতো রূপাও আগামী দিনের টপ মডেল। হালকা-পলকা দেহ নিয়ে র‍্যাম মাতাবে। ঈদের ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোতে রুপন্তীর পোশাক দেখতে পাব শিগগিরই। হয়তো একটা গানের দল খুলবে। হয়তো দেখব একদিন অভিনয়ে নেমে গেছে।

কখনো হোমপেজে অনেক বন্ধুর ফিড জমা হয়ে যায়। কত বিষয়। কত মানুষের কত দিকে আগ্রহ। ঠিক পড়ে ফেলা যায় না। প্রোফাইল বদল হচ্ছে। এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। আমি খুব মজার একটা জিনিস আবিস্কার করেছি। দেখ। আমি একটা সুন্দর কথা ভেবে ফেলেছি, পড়ো। আমি তোমাকে বন্ধু ভাবছি। আমি তোমার সম্পর্কে এটা বলছি। বলো তুমিও।

এই যে তোমরা যারা লাউপাতা হয়ে জন্মেছ

দুপুর বেলা তিন্নি ফোন দিয়া বলে, মেইলে আছিস?

আমি বললাম, কেন। তাড়াতাড়ি বল। জরুরি কাজ করতেছি।

জরুরি কাজ না ফেসবুকে বইসা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে চ্যাট করতেছো। কাজকাম কিছু করো নাকি সারাদিন এইসব চলতেছে?

আমি ক্ষেপে যাই। তিন্নি তুই কি আমার বস। কাজ না করলে তো আর এরা বসায়া বসায়া বেতন দিতেছে না, তাই না? শোন যা বলার তাড়াতাড়ি বল। আমি মিটিংয়ে ঢুকব।

তিন্নি বলে, ওই যে একদিন আমরা আলাপ করলাম না? সেইটা।

কোন আলাপ, কবে?

তিন্নি বলে অত বুঝায়া বলার মতো টাকা নাই ফোনে। একটা মেইল করছি, ইয়াহু খুলে তুই সেইটা দেখ। পরে আলাপ হবে। বাই।

তিন্নি ফোন রাখলে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। এখন ইয়াহু খুলে ওর ফালতু মেসেজ দেখতে হবে। আল্লাহর দুনিয়ায় মোস্ট ফালতু মেয়ে বলতে এই একটা। শুধু মেয়ে বললেও হয় না। ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে ফালতু শিরোমণি হলো এই তিন্নি। তিন্নির পরের ফোন আসার ভয়ে ইয়াহু খুললাম। গ্রুপ মেইলে আসা আর্টিকেল। উইমেন ওয়াচ মেল স্ট্রিপটিজ জাস্ট ফর ফান, বাট মেন ওয়াচ ফিমেইল স্ট্রিপটিজ ফর ডিপার রিজন। মেইল খুলে আপন মনে বললাম, ইন্টারেস্টিং।

ওই সময়েই তিন্নির ফোন। ডিড ইউ ফাইন্ড দ্যাট ইন্টারেস্টিং।

আ লিটল বিট। লিটল বিট মানে কি রে শালা। পুরাটা পড়। দেখ। ছেলেদের ডিপার রিজনটা কী বুঝতে পারবি।

ক্যাম্পাসে আমরা একটা খেলা খেলতাম। চকিতে চারদিকে তাকিয়ে যেখানে কারো চোখ সহজে যাবে না এমন জায়গায় লেখা একটা শব্দ বা দৃশ্য দেখে বলতাম।

আমি যা দেখি তুমিও কি তা দেখ?

তিন্নি বলত, তুমি কী দেখ?

আমি দেখি, আস্তে বাজান।

তিন্নি চারদিক খুঁজে বের করত লেখাটা। বলত, হর্ন আস্তে বাজান সামনে কলাভবন। তারপর সে বলত, আমি যা দেখি তুমি তা দেখো?

তুমি কি দেখ?

আমি দেখি একটা শাপলা।

আমি পুকুরে গিয়ে দেখতাম কোনো শাপলা ফোটে নাই। শাপলার দেখা নাই।

তিন্নি বলে, রিকশায় করে কে গেল। আরে গাধা শাপলা গেল না। ফুল নাই তো কী, শাপলা আছে না?

অনেক সময় কেটে যেত এরকম খেলতে খেলতে।

আমি যা দেখি তুমিও কি তা দেখ?

না।

ঢাকায় এসে একবার তিন্নির সঙ্গে ঘুরছি। আড়ংয়ে ঢুকতে গিয়ে একটা ম্যান সাইজ ছবিতে মডেলের ছবি দেখে তিন্নি বলল, আমি যা দেখি তুমিও কি তা দেখ?

অনেক দিন পর তিন্নির এ খেলায় চমকে উঠলাম।

বললাম, তুমি কী দেখ?

তিন্নি বলে, আমি দেখি ঝুমকা। আমি মডেলের ছবি তন্ন তন্ন করে খুঁজি, বললাম ঝুমকা কই?

তিন্নি বলে, বুদ্ধু এই মডেল না, ওই যে দরজার মডেলের কানে দেখ। ঝুমকা। ঝুমকা গিরা রে...

মেয়েরা যা দেখে ছেলেরা তা দেখে না। শাড়ি পরা মডেলের ছবি দেখলে তিন্নি সবার আগে দেখে শাড়ির ডিজাইন আর আমি দেখি মডেলের দেহ। দুইজন ভিন্ন কারণে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখি। তিন্নিকে আমি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথাটা বলি।

আমি যা নরমালি দেখি তুমি তা দেখো না।

তিন্নি বলে, ছেলেরা আসলে কী দেখে?

আমি বলি তুমি রাস্তাঘাটে ঘোরো তুমি বুঝো না?

তিন্নি বলে মেয়েরা আসলে কী দেখে?

আমি বলি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কখনো মনে হয় তারাও ছেলেদের মতো। অনাবৃত অংশগুলো দেখে। কখনো মনে হয় তারা মেয়েদের মতো আবৃত অংশগুলো দেখে। সেইসব আলাপ হয়তো তিন্নির মনে থাকবে। তাই সে আমাকে ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়ে মেইল ফরোয়ার্ড করে। ছেলেদের সেই ডিপার রিজন কী? ছেলেরা মেয়েদের দেহকে অনন্ত রহস্যের আধারই তো ভাবে। যখন পোশাক থাকা ও না থাকা শরীরের বাঁকে বাঁকে আলো-অন্ধকারের খেলা তৈরি করে তখন তাদের মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। হঠাৎই পেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এরকম সময়ে তিন্নি নয়, সুপর্ণার কথা মনে পড়ে। কারণ শরীর বলতে আমার কাছে একটাই। সুপর্ণার। একদিন সুপর্ণা ডাকে। বলে, আমি আজকে একটা কালো শাড়ি পরেছি। তুমি আসবে আমাকে দেখতে?

আজকে কি শোক দিবস কালো পরলে কেন?

তুমি জানো না, বর্ষায় কালো অথবা নীল পরতে হয়। মেঘের রঙ অথবা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়া আকাশের রঙ।

তোমাকে কেমন লাগছে বলো তো?

এসে দেখে যাও। এত কথা না বলে চলে আসো।

অনেক কাজ ছিল, কাঁচাবাজার থেকে কিছু তরিতরকারি কিনে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু শাড়ি পরা সুপর্ণার ডাকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেলাম। তিন্নির চোখ এড়ানোর জন্য গুলশানের আড়ং। সুপর্ণার মতো লাজুক মেয়ে ঝিরিঝিরি বর্ষার দিনে নাভির নিচে শাড়ি পরেছে। ছেলেরা ড্যাবড্যাব করে তার পেটের দিকে তাকাচ্ছে। সুপর্ণা কোনোরকমে হাতের মধ্যে শাড়ি পেঁচিয়ে ছেলেদের দৃষ্টির আড়ালে রাখছে নিজের পেট। আমি পৌঁছাতেই হাত সোজা করে বলল, বলো কেমন লাগছে? আমি বললাম, বলতে হলে বাইরে যেতে হবে। বৃষ্টির মধ্যে চলো, সিএনজিতে করে সারা শহর ঘুরতে ঘুরতে তোমাকে জানাই তোমাকে কেমন লাগছে। এখন একটু বলো। আমি বলি নাভিটা খুব সুন্দর। সুপর্ণা বলে, খাচ্চর। তুমি তো মানুষ হবে না। শোনো।

সুপর্ণা মাগুরার গল্প বলে। জানো, মাগুরা থাকার সময় আমি একদিনের জন্যও শাড়ি পরিনি। পয়লা বৈশাখে কি পূজায় সবাই যখন শাড়ি পরত তখন যে আমার কী ইচ্ছা হতো। মনে হতো, শাড়ি পরতে পারলে যেন আমার উৎসবটা পুরো হতো। অবশ্য শাড়ি পরে বাইরেও তো যেতে পারতাম না। ঘরেই থাকতে হতো, তাই না। এখন পরো। এখন তো চাইলে প্রতিদিনই পরতে পারো। চাইলেই পরা যায় নাকি? ঢাকা শহরে কাউকে প্রতিদিন শাড়ি পরতে দেখো? শাড়ি পরলে তুমি বাসে উঠতে পারবে? তোমাকে একদিন শাড়ি পরিয়ে দেব। বুঝবে কেমন লাগে। রিকশাতেও তো ওঠা যায় না। সিএনজিতে উঠে সুপর্ণাকে বলি, শাড়ি পরা অবস্থায় নাভি দেখতে কেন ভালো লাগে জানো? ওই যে একটা আলো-অন্ধকারের খেলা তৈরি হয় না? সেই আলো-আঁধারিটুকু খুব ভালো লাগে। সুপর্ণা বলে তুমি কিন্তু খুব অদ্ভুত। খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলো।

আমি বলি সুপর্ণা, একটা কথা বলবে সত্যি করে। আচ্ছা মেয়েরা যখন নাভির নিচে শাড়ি পরে অথবা ধরো ক্লিভেজ দেখা যায় এমন ড্রেস পরে তখন তো তারা জেনেশুনেই পরে যে, ছেলেরা হ্যাংলার মতো করে তাকাবে সেদিকে, তাই না?

তাকাবে কেন? আমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরব।

ধরো ভালো তো লাগে। ভালো লাগলে তাকাবে না?

হু। তো?

তখন মেয়েদের কেমন লাগে। আই মিন তোমার কেমন লাগে তখন?

বলব না।

ওকে লেট মি গেজ। তখন একটা শিরশির অনুভব হয়। অ্যাম আই রাইট?

তুমি কেমনে জানলে, খাচ্চর কোথাকার। কিছুক্ষণ একলা একলা হাসে সুপর্ণা। বলে একটা মজার ঘটনা জানো। মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন আমি একা একা শাড়ি পরতে শিখতে পারিনি। একা পরলে মনে হতো শাড়ি খুলে যাবে। বোঝো, কেমন কেলেঙ্কারি। তো মা মারা যাওয়ার পর আমি একদিন একটা অনুষ্ঠানে যাব। তো শাড়ি পরতে গিয়ে মার কথা মনে হলো। আমি কিছুতেই শাড়ি পরতে পারছি না। বের হতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি কী করব। আমি মা তুমি কোথায় বলে কাঁদতে শুরু করলাম।

সুপর্ণা, কাঁদলে তোমাকে কেমন লাগে?

সেটা তোমাকে দেখতে হবে না। এক সঙ্গে থাকলে কতই তো দেখবে। তোমার মতো লম্পট, লুচ্চা আমারে না কাঁদায়ে রাখবে। বলো।

তিন্নির হি ম্যান তারেকের সঙ্গে একদিন দেখা। বলে, আপনারা যাকে বলেন প্রেমে পড়ে যাওয়া। আই মিন, আ সাডেন ফিলিং দ্যাট ইউ আর ইন লাভ উইথ সামওয়ান। এইটারে স্টেটসে বলে ক্র্যাশ। কী বলে? ক্র্যাশ। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? অল অন এ সাডেন এরকম হয়। তো আপনার বান্ধবী তিন্নিরে দেইখা আমার ক্র্যাশ হয়ে গেছে। আমার ধারণা ওনারও একই রকম হইছে। লুক, ইন দিস ওয়ার্ল্ড আই বিলিভড দ্যাট দেয়ার ইজ নো মিরাকল। ইউ নো। আই লাইকড টু বিলিভ দ্যাট, আনটিল আই মেট তিন্নি। অ্যান্ড ইউ নো, ইন দিজ ডেইজ উই টকড আ লট। ইন দ্যা ক্যাপে, কফি শপ, হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। অ্যান্ড ইউ নো, আই ওয়াজ টোটালি আনঅ্যাওয়ার দ্যাট মাই টাইম ইজ কামিং টু ইটস এন্ড। অ্যান্ড হিয়ার আই অ্যাম টু গো স্টেটস ফর আ কনফারেন্স। আই সয়ার আই ওয়াজ অ্যান্ড অ্যাম জাস্ট ইন দিস ভেরি ওয়ার্ড, তিন্নি। টোটালি ফরগটেন দ্যাট আই হ্যাভ টু ক্যাচ আ ফ্লাইট আর ফ্লাই। সত্যি কথা বলতে খুব দুঃখের সঙ্গে ক্র্যাশ শব্দটা শিখেছিলাম। ক্র্যাশ। আমেরিকানরা প্রেমে পড়লে যে শব্দটা ব্যবহার করে। প্রেম না কাম? প্রেম ও কামনার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তিন্নির সঙ্গে তর্ক হতে পারে ইস্যুটা নিয়ে। ফেসবুক খুলে একদিন দেখি ওয়ালে লেখা, সামওয়ান হ্যাড আ সেক্রেট ক্র্যাশ অন ইউ। টু সি হার ক্লিক দিস লিঙ্ক। একটু ভাবতে বসলাম। অবশেষে? কিন্তু কে? তিন্নি? অন্য কেউ। কে হতে পারে? রিনা কাওসারি হতে পারে। এমনকি নাজিয়াও। কিন্তু পাবলিকলি জানাবে? এভাবে ওয়ালে লিখে বলবে? দেন ইটস রিনা কাওসারি। আড়াল নিয়ে আছে, তার পক্ষেই এমন সম্ভব। লিঙ্কটাকে ক্লিক করব কি-না ভাবতে ভাবতেই সাবিনা মেহনাজ সুপ্তি এসে হাজির।

আপনার ওয়ালে একটা লেখা দেখতে পাচ্ছেন? সামওয়ান হ্যাড আ সেক্রেট ক্র্যাশ অন ইউ?

তবে কি সুপ্তি? দ্য সেক্রেট ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড সুফি টিচার?

সুপ্তি বলেন, ডোন্ট ক্লিক দ্যাট লিঙ্ক। এটা ভাইরাস অথবা স্পাইওয়ার। এটাতে ক্লিক করে কালকে আমার হাজব্যান্ড অ্যাকাউন্ট হারিয়েছে।

আমি লিখলাম, হা হা হা।

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তি বলে, ছেলেগুলো খুব সহজে ভোলে জানেন। আমি আমার বরকে বললাম, আচ্ছা তুমি কি মনে করে লিঙ্কটায় গেলে বলো তো? কে তোমার প্রেমে পড়েছে ভেবেছিলে?

সে বলে, কিছু না। জাস্ট কিউরিসিটি। আমি বললাম, তা নয়। বলো তো কার কথা ভেবেছো। ভাবাটা তো আর খারাপ কিছু নয়। না ভাবাটাই তো অস্বাভাবিক। এবার আপনি বলেন তো শুভ কথাটা দেখার পর আপনি কার কার কথা ভেবেছেন? আচ্ছা বলতে হবে না। জাস্ট মজা করার জন্যই বললাম। ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি।

উঁহু, আপনার সঙ্গে কথা বলতে এত ভালো লাগে। মনে হয় জীবনের সব কাহিনী আপনাকে বলি। সত্যি কথা বলতে আমি একজনের কথাই ভেবেছি। তিন্নি। আমি তিন্নির কথা বলি তাকে। উনি মন দিয়ে শোনেন।

সবটা শুনে বলেন, আপনার কথাগুলো সিরিয়াসলি তাকে বলা উচিত আপনার অনুভূতির কথা।

কেমনে বলি?

সাবিনা বলে, বলব আপনাকে। আজ নয়। আরেকদিন। আপনি একটু ভাবেন তো। কাগজে লিখে ফেলেন তো, কেন আপনার তিন্নিকেই চাই। কেন অন্য কাউকে নয়? অনেক ভেবে ভেবে লিখে রাখবেন।

আমি জানি না, সাবিনা কী সমাধান দেবে। কিন্তু সেটা কোনো কাজে দেবে না নিশ্চিত। আর উনি যা বলবেন তা তো আমি করতে পারব না। আমি স্বভাবে খুব অস্থির। আমার অস্থিরতা দেখে তিন্নির হিম্যান তারেক বলেছিল, লুক জেন্টেলম্যান ইউ আর নট লিসেনিং টু মি। আই'ল সাজেস্ট ইউ টু প্র্যাকটিস ইয়োগা। ইউ নো ইয়োগা? ইট মে হেল্প ইউ টু কুল ডাউন। তারেক কীভাবে জানবে, আমি ঠিক ওর কথার কারণেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কিন্তু বলতে পারছি না। ওকে জাস্ট একটা থাপ্পড় দিতে পারলেই হতো। কিন্তু থাপ্পড় না দিয়েই থাকতে হচ্ছে। তারেক মাস্টারি করতে ছাড়ে না। আজব ব্যাপার। সবার কাছেই নিজের মতো করে একটা সমাধান আছে। কেউ বলবে অ্যাকিউপ্রেসার করো, কেউ বলবে ইয়োগা, জেন কেউ বলবে সুফি, কেউ বলবে জাস্ট ট্রাই হোমিওপ্যাথি। আমি জানি না কোন পথে তিন্নিকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব। আই রিয়েলি ডোন্ট নো।

এবং আয়না বেয়ে মেঘ পালকের সারি নেমে যায়/পাহাড়তলীতে

নাজিয়া দেখা দেয় আবার। ওর গভীর রাতে। আমার সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়ে। বলে কেমন আছো? ওহ সরি, মনে আছে তো তুমি করে বলব বলেছিলাম। ওইদিন থেকেই তোমাকে বন্ধু ভাবছি। তুমি খুব নাজুক একটা সময়ে আমার পাশে ছিলে। জানো তো, তোমার সবচেয়ে খারাপ সময়ে হয়তো দেখবে তোমার নিত্যদিনের সঙ্গীটাই অনুপস্থিত। আর যাকে পেয়েছো তার হয়তো সেখানে থাকার কথাই ছিল না। কিন্তু সেই হয়তো তোমাকে রাত জেগে সঙ্গ দিচ্ছে। তোমার শুশ্রূষা দিচ্ছে, তোমাকে নিয়ে হাসপাতালের বেডে বেডে দৌড়াদৌড়ি করছে। মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানো, জীবনটা কোইন্সিডেন্টাল। জীবনের বেইজটা কোইন্সিডেন্স। অথচ আমরা কত নিশ্চয়তা আর পরিকল্পনা দিয়েই না ভরিয়ে রাখতে চাই জীবনকে। হয়তো অনিশ্চয়তার কথা জানি বলেই সেখান থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্যই আমাদের যত নিশ্চয়তার আয়োজন। থ্যাংকস। থ্যাংকস এ লট।

আমি বললাম কী যে বলো না। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। জাস্ট বসে থাকলাম। এমন বসা তো প্রতিদিনই বসে থাকি। বরং তোমার কথা শুনে কিছু লাভ হয়েছে। আই লাইকড ইউ। তুমি খুব দৃঢ় একটা মেয়ে। আই লাইকড ইট ভেরি মাচ।

নাজিয়া খুশি হয়ে খুকির মতো বলে, শোনো একটা সুখবর আছে। আমি আর নিউইয়র্কে নেই। সুযোগ এলো তাই কাজের জায়গা শিফট করে একই কোম্পানির পোস্টিং নিয়ে নিউ জার্সি চলে এসেছি। এখানে বাঙালি কম। যে এলাকায় থাকি সেটা খুব সুন্দর। ঠিক শহর না। শহর থেকে অনেক দূরে। ছোট ছোট বাড়ি। বাগান। বিস্তীর্ণ মাঠ। আমি প্রতিদিন সকালে উঠে ঘাসে ঘাসে পা ফেলি। খালি পায়ে হাঁটি। তুমি কতদিন খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটো না? হাঁটবা। খালি পায়ে হাঁটলে তুমি নিজের মধ্যে নিজেকে আবিস্কার করতে পারবে। কে যেন বলেছিলেন, হাঁটা হলো নিজেকে আবিস্কার করার একটা মাধ্যম। তুমি হাঁটছো বহন করে চলেছো নিজেকে। যত হাঁটবে ততই নিজেকে বহন করতে আরাম অর্জন করতে পারবে। আচ্ছা বলো তো তুমি কি একটু মোটা? একটু মোটা? এখনো বিয়ে করোনি তাই না? বিয়ে করলেই মোটা হয়ে যাবে। এখন থেকে হাঁটার অভ্যাস করো। কাজে লাগবে। আর শোনো বিয়ের আগে যখনই সময় পাও নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বে। ট্রেনে করে বেরিয়ে পড়বে। কোনো অজানা স্টেশনে নেমে গ্রামের দিকে অনেকদূর হেঁটে যাবে। সন্ধ্যার দিকে ফিরবে। অনেকক্ষণ ধরে ট্রেনের জন্য বসে থাকবে। খুব ভালো লাগবে। দেশে এমন কখনো করিনি জানো। এদেশে এসে অনেকবার এমন করেছি। নিরুদ্দেশযাত্রা। এরা

জানো খুব ঘোরে। উইকএন্ডটা ঘরে বসে কাটায় না। আমিও ওদের ফলো করি। এখানে তো গ্রাম নেই। তবু ধরো কোনো এক উইকএন্ডে দূরে কোথাও চলে গেলাম। নাফিসের সঙ্গে থাকার সময় ওকে মাঝে মাঝে বলতাম, চলো কোথাও আউটিংয়ে যাই। ও যেতে চাইত না। জোরাজুরি করলে রাজি হতো। কিন্তু গত কয়েক মাসে এক থাকার সময়গুলোতে কত যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় গিয়েছি। তুমি হয়তো বলবে নিজের কাছ থেকে পালানোর জন্য এইসব নিরুদ্দেশ যাত্রার আয়োজন। হয়তো সেটাই সত্যি। কিন্তু আরেকটা জিনিস আমার মনে হয়। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের অল্প একটু পৃথিবীতেই কেমন অনায়াসে হারিয়ে যেতাম, যেতে পারতাম। আর বড় হয়ে দেখো, কতইবা বড় হয়েছি আমরা, আর হারাতে পারি না। রিয়েল হারিয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায় তেমন পথ হারানোর ঘটনা আসলেই ঘটে না। আমার মনে হয় কি জানো আমরা আসলে এইসব নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যেতে চাই। হারিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে ভুলে থাকতে চাই।

আমার একটা সঙ্গী হয়েছে এখানে, নিউ জার্সিতে উঠেছি বললাম না, এখানে। কাল ভোরে উঠে একটা গাছের পাতা গুনছি তো দেখি দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে একটা মেয়ে। আমারই বয়সী। শেরি। ওর বাড়িটাও আমার মতোই। ছোট, সুন্দর। একাই থাকে। ওর কাহিনী আমার মতো। তসলিমার একটা কবিতা পড়েছিলাম। পড়েছো কখনো? ওই যে ওই কবিতাটা। যেখানে সে এক বিদেশি মেয়েকে বলছে, তোমার গল্প বলার দরকার নেই। কারণ তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি, তোমার গল্পটা আমার গল্পের মতোই। পৃথিবীর সব মেয়ের গল্পই এক। শেরি আমার মতো বিষণ্ন নয়। খুব উইটি। এইসব ব্যাপারকে ওরা খুব একটা পাত্তা দেয় না। ও বলে, আমাদের দুই বাসার সামনের রাস্তাটার নাম দেবে ডিভোর্সড উইমেনস লেইন। মজা না? শোনো তুমি চা খাবে? আমার কাছে ভালো চা আছে। গ্রিন টি। জেসমিনের ফ্লেভার। আমি খাব। তুমি চাইলে তুমিও নিতে পারো। গ্রিন টি খেতে চাও না কেন বলো তো। গ্রিন টি তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। শোনো, গ্রিন টি চোখ বন্ধ করে খাবে। ঘ্রাণ নেবে। শুধু গরম পানিতে টিব্যাগ দিয়ে তৈরি করতে হয়। সুগার ছাড়া চা খাওয়ার অভ্যাস করো। ইউ উইল ফিল গুড। ঢাকায় গ্রিন টি পাও না? গুলশানের বড় শপিং কমপ্লেক্সগুলোতে খোঁজ করো। ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, জেসমিন যা পছন্দ ট্রাই করো। হেসো না। বিয়ে হয়নি তো কী হয়েছে? বসে থাকতে থাকতেই মোটা হয়ে যাবে। টেরও পাবে না। একদিন দেখবে হঠাৎ করেই শরীরটা ভারী ভারী লাগছে। তখন ওয়েট কমানোর জন্য কত কী করবে। কোনো লাভ হবে না। এসব নিজেকে দিয়ে বলছি। আমি নিজে অনেক মোটা হয়ে গেছি তো। সবচেয়ে অবাক করার ব্যাপার কী জানো। এই কয় বছরে নিজের দিকে তাকানোর সময় পর্যন্ত পাইনি। এতটা মুটিয়ে গেছি। বয়সের ছাপ এমনভাবে পড়েছে বুঝতে পারিনি। দুটো মানুষ যখন এক সঙ্গে থাকে তখন তারা না তাকায় পরস্পরের দিকে, না নিজেদের দিকে। একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকে শুধু। দু'জনে প্রতিযোগিতা করে স্বার্থপরতার চিন্তা করে। নিস্তরঙ্গভাবে, ঘটনাবিহীনভাবে এ সবই ঘটতে থাকে। তারপর হঠাৎ যখন একদিন

বুঝতে পারে, দেয়ার ইজ সামথিং রঙ। তখন একসঙ্গে অনেক কিছু চোখে পড়ে। আমি যে এত মোটা হয়ে গেছি, সেটা ভালো করে অনুভব করতে পারলাম বিয়ের পর। তুমি হাসছো? ভাবছো আমি ভয় পেয়ে গেছি, কেউ ফিরে তাকাবে না বলে ব্যায়াম শুরু করেছি। এসব কিছুই নয়। শোনো, এসব কিছু না। রিডিসকভারিং দ্য সেলফ। আই গট অ্যান অপারচুনিটি। নাফিস একদিক থেকে উপকারই করেছে। অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি যে এত বোকা!

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে নাজিয়া। তারপর এ সময় সাইন আউট হয়ে চলে যায়।

পরপর তিনদিন দেখা মেলে না তার। হঠাৎ এক দুপুরে এসে নক করে। আমি বলি, এত রাতে? ঘুম আসে না। আর সত্যি বলতে মনটা খুব খারাপ। নাহ নাফিসের কথা মনে পড়ছে না। মনে পড়ার মতো কিছু তো সে করেনি। শেরির খুব ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবী মারা গেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার শেরি কোনোদিন তাকে দেখেনি। কুইবেকে থাকত। মাইস্পেসে শেরির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। প্রতিদিন যোগাযোগ হতো। মেইল চালাচালি হতো। শেরি বলল, শি ওয়াজ লাইক মাই মাদার। ও নাকি একবার কুইবেক যেতেও চেয়েছিল। কিন্তু যেতে পারেনি। দেখা হয়নি কিন্তু যোগাযোগটা পারিবারিক হয়ে গিয়েছিল। শেরির সব কথা জানত উনি। ওনার পরিবারের সবাইকে চিনত শেরি। একদম হঠাৎ করেই মারা গেলেন। মারা গিয়েছেন আসলে দু'দিন আগে। হঠাৎ ওনার ছেলের মনে পড়েছে শেরিকে জানানো হয়নি। মেইল করেছেন। শেরি এখন সারাদিন ধরে কাঁদছে। ওর মতো প্রাকটিক্যাল মেয়ের ইমোশন দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি জানো। মারিয়া বলে কুইবেকের কাউকে কি শেরি আসলেই চিনত-জানত? ভার্চুয়াল রিলেশন বলতে আলাদা কিছু কি আছে? নাকি সবই রিয়েল? জানো আমিও কাঁদলাম মারিয়ার জন্য। মারিয়ার ছবি একটা প্রিন্ট করে এনেছে শেরি। তাতে দু'জনে মিলে ফুল দিলাম। ঘুম আসছে না জানো। একদম ঘুম আসতে চাইছে না। সকালে কীভাবে অফিসে যাব ভাবছি। শোনো, যাই আজ। ঘুমানোর চেষ্টা করি। না পারলে আবার তোমাকে বিরক্ত করব। ঠিক আছে? ওকে। সো সুইট ইউ আর।

নাজিয়া পরপর কয়েকদিন শুধু মারিয়ার গল্প করতে থাকে। কারণ ওর প্রতিবেশী শেরি কয়েকদিন শুধু মারিয়ার গল্প করে। মারিয়ার স্মৃতি আওড়ায়। নাজিয়ার মাধ্যমে মারিয়ার জীবনের গল্পটা আমার মনে একটা কাহিনী হয়ে উঠতে থাকে। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের কাহিনী এক। বিশেষ করে মানুষের অসহায়ত্বের গল্পগুলোর মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই। মারিয়ার বয়স ছিল ওল্ড হোমে যাওয়ার মতো। যৌবনে নিজের আর স্বামীর আয় মিলিয়ে কুইবেকে একটা বাড়ি বানিয়েছিল। সে বাড়িটাই তাকে ওল্ড হোমের ক্লান্তিময় জীবন থেকে বাঁচিয়েছিল। ওল্ড হোমের জীবন কি ক্লান্তিকর? নাজিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করে, কারণ শেরি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি বলি, আমি আসলে জানি না। এমনকি ওল্ড হোম কখনো দেখিনি। তিন ছেলেমেয়ে মারিয়ার। টমাস, বিল ও ভেরোনিকা। প্রত্যেকেই যার যার মতো করে ব্যস্ত। ভেরোনিকা

ইউএসএতে। টমাস ও বিল কানাডায় নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। প্রচণ্ড গতি তাদের জীবনে। নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্যও তাদের সময় নেই। কোনো কোনো ক্রিসমাসেই শুধু মাকে দেখতে আসার সময় মেলে। কখনো মেলেও না। তখন মারিয়া শীতের সন্ধ্যায় একা একা কফিশপে গিয়ে বসে থাকে। নিজের একাকিত্বের দিকে চোখ মেলে তাকায়। চারদিকে তাকিয়ে কথা বলার একজন মানুষকে খোঁজে। কিন্তু তার মতো বৃদ্ধার সঙ্গে কেন কথা বলবে কেউ? কখনো স্টোরে গিয়ে একদৃষ্টে কেনার মতো একটা জিনিস দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ভারি পাওয়ারের চশমা চোখে লাগিয়ে একটু হেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টোরের জিনিসপত্র দেখে। অনেক সময় লাগিয়ে বাজার করে। মারিয়ার দিনের সবচেয়ে সুখের সময় ওই স্টোরের সময়টুকু। যখনই বাড়িতে খুব ভোর হয়ে যায় তখনই হাতের লাঠিটা ঠক ঠক করতে করতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। ধীর পায়ে ঠুকঠুক করে ওই স্টোরে গিয়ে হাজির হয়। কখনো পার্কে একা বসে থাকে। কফিশপে বসে প্রেমিক জুটিদের দিকে আড়চোখে তাকায়। হাতে থাকে ছোট পোটলা। নিজের খাবার নিজেই বানিয়ে নেয়। আর ইন্টারনেটে বসে থাকে। মারিয়া বলেছিল, যদি ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে না শিখত! তবে কী হতো? পরিচিত কেউ সচরাচর ফোন করে না। কারণ তিন-চার দিন কথা না বলতে বলতে অস্থির হয়ে ওঠা মারিয়া কারো ফোন এলে আর ছাড়তে চাইত না। ছেলে-মেয়েরা তাই সামান্য একটু ভয়েই থাকত। একটু কথা বলে রেখে দিত। একদিন শেরিও কথা বলত ফোনে। মারিয়া কত যে গল্প বলে। গল্পের কেন্দ্রে আছে একতলা একটা শাদা বাড়ি আর কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে একটা বড় শপিং স্টোর। নেটে বসে মারিয়া প্রতিদিন ছেলে-মেয়েকে মেইল করত। ফোন না করলেও মেইলে একটা-দুটো শব্দ ছেলে-মেয়েরা লেখে। খোঁজ নেয়। একটা-দুটো অক্ষর বারবার করে পড়ত মারিয়া। কেউ একটা-দুটো লাইন লিখলে, চোখ একেবারে স্ক্রিনের কাছে নিয়ে গিয়ে জোরে জোরে পড়ত। আর হেসে উঠত আপন মনে। মারিয়াকে মাইস্পেসের সংবাদ কে দিয়েছিল কে জানে। সেখানে ৩৯ জন বন্ধু হয়েছিল তার। প্রায় সবার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। চ্যাটরুমে ঠিক অভ্যস্ত ছিল না। দ্রুত লিখতে পারত না। কিন্তু মেইলে উত্তর দিত খুব যত্ন করে। মাইস্পেসের পরিচয় থেকেই শেরির সঙ্গে পরিচয়। মারিয়া বলত, ইন্টারনেট ব্যাপারটা অদ্ভুত। ধরো তুমি একা আছো, ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতো করে ব্যস্ত। কেউ নেই পাশে। দেখবে পৃথিবীর কোথাও তোমার মতোই একজন বসে আছে। হয়তো তার মন খারাপ। সে তোমার অপেক্ষায় আছে। বলত, লিখে লিখে কথা বলা তার ভালো লাগে। সারাজীবনে যা চিঠিপত্র লিখেছে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি লিখেছে মেইলে। শেরির মেইল দিতে দেরি হলে ফোন করত। বলত, ফোনের তুমি একটা অপরিচিত মেয়ে। কিন্তু মেইলে যখন তোমার নামটা দেখি মনে হয় তুমি আমার খুব চেনা। মাঝে মাঝে টেকনিক্যাল নানা সমস্যা হতো কম্পিউটারে। তখন খুব অস্থির হয়ে থাকত। সারাইয়ের লোকদের বারবার ফোন দিত। শেরি বলে, তার মাঝে মাঝে মনে হতো, কুইবেকে সেই একলা বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসবে। চারদিকে সারসার বার্চ গাছ। তুষার জমে পার্কের জমিন শাদা হয়ে আছে। তীব্র কুয়াশার মধ্যে

যেখানে মারিয়া হেঁটে হেঁটে উজ্জ্বল আলো ভরা স্টোরে চলে যায়। দুই ঘন্টার শপিং সেরে একটা কফি শপে একলা বসে থাকে। তারপর সেই কুয়াশা ঘেরা একলা বাড়িতে চলে আসে। আলো জ্বালিয়ে বসে থাকে। একটা মেইল পাঠিয়ে সারাদিন সেটার উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ে। হয়তো মৃত্যুর সময়ও একইভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বুঝতেও পারেনি মরতে যাচ্ছে। প্রথমে স্টোরের লোকগুলো বুঝতে পেরেছিল তাদের নিয়মিত অতিথি মিসেস মারিয়া আজ আসেননি। ফোন দিয়েছিল বাসায়। ফোন কেউ না ধরলে পুলিশে খবর দিয়েছিল।

নাজিয়া বলে, শোনো শেরিকে তোমার কথা বলেছি। শেরি কী বলে জানো? বলে প্রতিদিন কারো সঙ্গে কথা হলে বুঝতে হবে সে তোমার ঘনিষ্ঠ। ভাবছি, প্রতিদিন কথা বলে বলে আমরা কি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি? আমি বলি, আমার কথা কী বললা? কিছু না। এই যে তুমি গল্প শোনো। ধৈর্য আছে। বন্ধুর মতো ভালো পরামর্শ দাও। এইসব। বাদ দাও। একটা গল্প বলি?

কাল একা একা আমাদের বাড়ির পাশেই একটা লেকের ধারে গিয়েছিলাম। বিশাল একটা লেক বুঝলা? কিন্তু পানিতে একটা ঢেউ পর্যন্ত নেই। একেবারে শান্ত আয়নার মতো পানি। মনে হয় চেহারা দেখা যাবে। তোমাকে ছবি পাঠাব। খুব ভালো লাগবে তোমার। তুমি কখনো এমন শান্ত জলাধার দেখেছো?

আমি ছোট করে উত্তর দেই, হু।

আমি তোমার স্বপ্নে পাওয়া আঙ্গুল/স্পর্শ করি জলের অধিকারে

তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। ক্যাম্পাসে মন বসেনি তেমন করে। নিরুদ্দেশ যাত্রার একটা রোগ কাজ করত আমার মধ্যে সবসময়। মনে হতো কোথাও বেরিয়ে পড়ি। অচেনা স্টেশনে নেমে যে কোনো দিকে হেঁটে হেঁটে পৃথিবীর কোনো সবুজ গ্রামে পথ হারিয়ে ফেলি। সারাটা দুপুর রোদে রোদে ঘুরে বেড়াই। কোনো একটা নদীর তীরে উঁচা রেইন ট্রির পাতায় পাতায় শালিকের ওড়াউড়ি দেখি। পঞ্চগড় গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। মহানন্দার পাড়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর ঢাকা ফিরব। সৈয়দপুরে এসে ওদের বললাম আমি আর যাব না। ওরা অবাক হয়ে গেল। কই যাবি? বললাম, খুলনা যাব খালার বাড়িতে। নেমে পড়লাম। দুপুর বেলা সৈয়দপুর শহরটা ঘুরে বেড়ালাম। বিকেলে ট্রেন। টিকিট কেটে অনেকক্ষণ স্টেশনের পত্রিকার দোকানের সামনে বসে থাকলাম। ওয়েটিং রুমে ঝিমালাম। হুমায়ূন আহমেদের বই শেষ করলাম। ব্রড গেজ লাইনের ট্রেনে উঠেছো কখনো? ঝম ঝম গম গম শব্দ হয়। মিটার গেজের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে চলে। সিটগুলো আরামদায়ক, নরম। ট্রেনে উঠে দেখলাম আমার ঠিক মুখোমুখি সিটে একটা সুন্দর মেয়ে বসা। সঙ্গে মালপত্র সুটকেস। পুরো পরিবার। ট্রেন চলতে শুরু করল। জানালার ধারের মুখোমুখি সিট দুটোয় আমি আর সেই মেয়েটা। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছি অনেকক্ষণ মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে। এভাবে নীরব চোখাচোখি আর জানালার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে পুরো সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওই বয়সে যা হয়। ওই বয়স তো তোমারও গেছে, তাই না? আমাদেরও গেছে। হয়তো তোমাদের আলাদা রকম ছিল। কিন্তু আমাদের ওই বয়সটা ছিল আড়ষ্ট একটা সময়। ট্রেন পাকশী স্টেশনে এলে একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। পাকশী ব্রিজের নিচে লঞ্চে অনেক উঠেছি। কিন্তু কখনো ব্রিজের ওপরে ট্রেন দিয়ে যাইনি। তখন বর্ষাকাল জানো? আকাশে মেঘ কিন্তু দূরে দূরে। পাকশী আসার আগেই সবুজ ট্রেন লাইনের প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলাম। দূরের বাজার কাছের মানুষ খুব ভালো লাগছিল। ট্রেন ব্রিজের ওপর ওঠার আগেই দেখলাম সেই অপূর্ব জলমণ্ডল। সন্ধ্যার আলো তখনও মেলায়নি। নীল জলে একটু একটু একটু শাদা-কালো মেঘের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। সামনের মেয়েটাকে বললাম, দেখো দেখো। সেও অবাক হয়ে দেখল। পুরো আয়নার মতো জল। স্থির। নদীর আগে একটা বড় জলাধার। তারপর নদী। ভরপুর নদীর জলও দেখলাম শান্ত স্থির। কোনো ঢেউ নেই। তখন তো তেমনই দেখেছিলাম। কিন্তু বর্ষার পদ্মার কথা চিন্তা করলে এখন ভাবি হয়তো স্থির ছিল না নদীর জল, হয়তো দ্রুতগতির ট্রেনে করে জল পাড়ি দেয়ার সামান্য দৃশ্যটা স্থির হয়ে গিয়েছিল। তমা সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা-মাকে ডেকেছিল।

দেখিয়েছিল অপূর্ব স্বচ্ছ সেই নীল জল। ওই সূত্রেই কথাবার্তা চালু হয়ে গিয়েছিল। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। জানতে চাচ্ছিলেন। কোথায় থাকি, কোথায় পড়ি, বাড়ি কোথায় এসব। আমিও জানলাম কিছু। তমার সঙ্গে কথা হচ্ছে। রাতে ট্রেনের ক্যান্টিনে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর হলো খুলনা স্টেশনে। ঠাণ্ডা বাতাস আর সকালের নরম আলো ধীরে ধীরে স্টেশনে স্থির হয়ে এলে আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার সামনের সিটে কেউ নেই। হয়তো রাতেই কোনো স্টেশনে নেমে পড়েছে। আমার ঘুম না ভাঙিয়ে চলে গেছে। মনটা খুব ভার হয়ে গের। অন্তত তমা তো জাগাতে পারত। ভাবতে ভাবতে নামছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার বুকপকেটে একটা চিরকুট। তমার ঠিকানা, যশোরের মনিরামপুরের একটা বাসার ঠিকানা। কোনো এক ফাঁকে খবরের কাগজে টুকরোয় লিখে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বহুদিন ওই চিরকুটটার দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বিস্ময়কর চিরকুটটায় একটা ঠিকানা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু না লেখা অনেক কথা সহকারে চিরকুটটা আমি বারবার পড়তাম। বহুদিন বহুকাল জমিয়ে রেখেছি সেই চিরকুট। একটার পর একটা চিঠি লিখেছি চিরকুটের ঠিকানায়। কিন্তু কোনো চিঠিরই উত্তর আসেনি। হয়তো ঠিকানায় ভুল ছিল, হয়তো বাসা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল।

নাজিয়া বলে তারপর?

তারপর আর কী? একসময় ভুলে গেলাম।

কিন্তু হঠাৎ কয়েক বছর পর তমার কথা মনে হতো। থুঁতনি কাটা, বাঁকা চোখের মেয়েটা। তো একদিন ভাবলাম তমাকে খুঁজি ফেসবুকে। সার্স দিলাম। তোমার কোনো ধারণা আছে কত তমা আছে এই ফেসবুকে? ৫০০-ছয়শ' অনেক। সবার মুখ দেখে সেই মুখটা কয়েক ঘণ্টার দেখা তমাকে মেলানোর চেষ্টা করলাম। একদিন দুইদিন তিনদিন খুঁজলাম। খুব দরকার ছিল তা নয়। হাইড অ্যান্ড সিক। খেলাই মনে করো। হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে বের করা। সে ফেসবুকে আছে কি-না তাও তো জানি না। থাকলেও দেখতে এতদিনে কেমন হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা তো নেই। তবু আন্দাজে খুঁজতে থাকলাম। একটা একটা করে মুখ দেখলাম। খুঁটিয়ে। কয়েকদিনের অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর মনে হলো। একজন হয়তো তমা। গোল মুখ, স্বাস্থ্যবান, কাটা থুঁতনি, বাঁকা চোখের এক তমার দেখা মিলল। আরেকজনকে মনে হলো সেও তমা হতে পারে। চেহারার মিল আছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার তমা শ্যামলা না ফর্সা ছিল স্মৃতি থেকে তা আমার মনে পড়ছিল না। খুব অবাক করা ব্যাপার। দু'জনের প্রোফাইলই রেস্ট্রিকটেড। অ্যাড করা যায় না। শুধু মেসেজ দেয়া চলে। দু'জনকেই মেসেজ পাঠালাম। হ্যাভ ইউ এভার বিন টু যশোর। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। কোনো উত্তর নেই। তমার কি তাহলে উত্তর দেয়ারই রেওয়াজ নেই। আবার দু'জনকে মেসেজ পাঠালাম। আপনি কি কখনো পাকশী ব্রিজের ওপর সন্ধ্যার আলোতে জল দেখেছিলেন। এবার উত্তর এলো দু'জনের কাছ থেকেই। একজন লিখল, আপনি কি কবি? আরেকজন বলল, অনেকবার। অনেকবারের উত্তরে বললাম,

একবার এক বর্ষার দিনে আপনি পাকশী ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন মনে আছে? একজনের পকেটে চিরকুট রেখে গিয়েছিলেন। মনে আছে।

আপনি কি কবির উত্তরে লিখলাম, কবি নই। কিন্তু ওই দৃশ্যটা ভালো লেগেছিল।

পরদিন দু'জনেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালো। সঙ্গে মেসেজ। শুনে মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং। সামনের ডিসেম্বরে দেশে যাব। বেড়ানোর জন্য নতুন জায়গা খুঁজছি। আপনি বলুন তো ঠিক কোন জায়গাটার কথা বলছেন। ওখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে?

আরেক তমা লিখেছে, সত্যি কথা একদম একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যি কথা। ট্রেন থেকে নামার পর কয়েকদিন। ব্যস। তারপর আর কেন যেন আপনার কথা আর মনে পড়েনি। চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু কেন যেন আর উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়নি। আপনি মনে রেখেছেন ভেবে অবাক হচ্ছি। কেমন আছেন, কোথায় আছেন?

আলাপ শুরু হয়ে গেল। এটা-সেটা খোঁজখবর। বিয়ে করেছে তমা। ফুটফুটে দুটো বাচ্চা আছে। শ্যামলীতে থাকে। বললাম এত কাছে? এসো একদিন। এইসব নানা আলাপ। বলল, কী অদ্ভুত ব্যাপার না! বাচ্চা বয়সেই অমন হয়। আমি কি ভেবে যে চিরকুটটা লিখে দিয়েছিলাম। পরে যখনই মনে হতো তখনই খুব লজ্জা লাগত। তমা ওর হ্যাজব্যান্ডের গল্প বলে। এটা-সেটা নানা কথা হয়। নিয়মিত যোগাযোগ। বলে আসো একদিন, আমার হাজব্যান্ডকে তোমার কথা বলেছি। সে তো হাসতে হাসতে শেষ। বলে তোমরা তো ক্লাসিক্যাল প্রেমিক- প্রেমিকা। তা বিয়ে করোনি কেন? নিশ্চয়ই বলবা ট্রেনে দেখা মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করতেছিলা? হা হা হা। তুমি কি বলো তো? এতদিনের কথা মনে রেখেছো। ঠিক আছে। কিন্তু ফেসবুকে সার্স দিয়ে আমাকে বেরও করে ফেললা। আমি খুব অবাক হইছি। শোনো, আমার হাজব্যান্ড বলছে, তুমি যেন অবশ্যই একদিন আসো। কবে আসবা বলো।

আমি বাসায় ফিরে আসি। ডায়েরিগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে তমার সেই চিরকুটটা বের করি। একেবারে হলুদ হয়ে গেছে খবরের কাগজটুকু। ওই কাগজটুকু স্ক্যান করে একদিন তমার ঠিকানায় পাঠাই। পাঠানোর আগে বলি, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মেইলে অ্যাটাচ করে চিরকুটটা পাঠানোর পর তমা ফোন দেয়। বলে, এতদিন ধরে চিরকুটটা কেন রেখেছো বলে তো? এটা কী মিন করে? তুমি বিয়ে করোনি কেন? অদ্ভুত ব্যাপার তো। তুমি পাগল নাকি?

আমি বললাম, তমা ভয় পেয়ো না। তোমার জন্য বিয়ে করিনি এটা ভেবো না। কিন্তু তোমার চিরকুটটা একটা ব্যাপার ছিল আমার জন্য অনেকদিন। কত গল্প করেছি বন্ধুদের কাছে ওই চিরকুটটা নিয়ে। তোমাকে নিয়ে। ওই ট্রেনযাত্রা নিয়ে। শোনো এইটার হয়তো কোনো মিনিংই নেই। ওই চিরকুট থেকে অনেক দূরে আমরা। কিন্তু ওই চিরকুটের আনন্দটা আমার কাছে অনেক মুহূর্তের চেয়ে সুখকর মনে হয়।

তমা হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে যায়। বলে, তোমার সঙ্গে দেখা করব। তোমার ঠিকানা দাও।

নাজিয়া বলে, দেখা হয়েছিল?

আমি বলি, দেখা হয়নি। তমা বলে, তুমি একটা ভীতু। এতদিন ধরে যার স্বপ্ন দেখেছো সে যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তখন আর আগাতে পারছো না। আমি বলি, তমা শোনো ঠিক দেখো একদিন সময় পেলে ঠিকই তোমার বাসায় গিয়ে হাজির হবো। আচ্ছা শোনো তোমার বাচ্চারা কোন আইসক্রিম পছন্দ করে?

নাজিয়া বলে, দেখা করো না কেন?

দেখা করতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মনে হয় দেখে আসি তো তমাকে। পরে মনে হয় ১৫ বছর ধরে গড়ে ওঠা গল্পটা মাঠে মারা যাবে। কেমন যে দেখব তাকে? হতাশ হওয়ার ভয় ধরে মাথায়। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই তমা আসলে সেই তমা নয়। কোনোভাবে প্রমাণের উপায় নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়। জাস্ট একটা কিউরিসিটি থেকে তমা আমার মেইলে সাড়া দিয়েছিল। তারপর গল্পটা বুঝতে পেরে নিজে তমা হয়ে গেছে।

নাজিয়া হাসে, বলে না। এটাই সেই তমা। আমি নিশ্চিত।

শোনো তুমি গ্রিন টি খাচ্ছ তো? পেয়েছো গ্রিন টি?

সমুদ্রতীরকে তুমি বিদায় জানাও! বলো বিদায় ঝাউয়ের বন।

অনেকদিন সুপর্ণাকে অনলাইনে পাই না। হয়তো ফেসবুকে লগইন করে চ্যাটবক্স অফ করে রাখে। ফোনও ধরে না। খুব অদ্ভুত মেয়ে। পরপর দশবার কল দিলেও ধরে না। একটা মেসেজ পাঠায়, বিজি। বুঝতে পারি সুপর্ণা আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ভুলে যাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, নওরোজ ভাই একদিন বলেছিল। মি. শুভ ভালো করে চিন্তা করে দেখলাম বিষয়টা বুঝলেন। সাপ দেখেছেন? সাপ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন? শোনেন সেদিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখছিলাম। মাঝে মাঝে ঘুম আসে না। রওনক বিছানায় পিঠ হেলালেই ঘুমায়ে পড়তে পারে। মানুষের ঘুমানোর এই ক্ষমতাটাকে আমি ঈর্ষা করি। রওনকের এই ক্ষমতা আছে। এজন্য মাঝে মাঝে ওকে আমার মহামানবী মনে হয়। মনে হয়, সবচেয়ে সুখী মানুষটির মহামানব হওয়ার ক্ষমতা আছে। কী ব্যাপার নওরোজ ভাই, আজকে বেশ ভাব আসছে মনে হয়। নওরোজ ভাই একটু থমকে যায়। ভাবের কী আছে বলেন। সাপের ডকুমেন্টারিটা দেখে আমি রওনককে বললাম, শোনো কাল রাতে সাপের একটা ডকুমেন্টারি দেখলাম। রওনক বলে, এইগুলা কেমনে দেখো বলো তো। এত সময় তোমার। ফেসবুক ওপেন করে বসে থাকলেও তো পারো। সবসময় এসব উল্টাপাল্টা অনুষ্ঠান দেখো। খবরদার আমাকে সাপের গল্প বলবা না। সামনের ঈদে বাড়ি যাব। বাড়ি গিয়া তোমার এসব গল্প খালি মনে পড়ে। আমি একা ঘুমাইতে পারি না। খবরদার সাপের গল্প করবা না। বলতেও পারলাম না। আপনাকে অনলাইনে পেয়ে ভাবলাম আপনাকে বলি। আপনার আবার সাপের ভয় নাই তো। কী যে বলেন।

জিনিসটা তাহলে আপনাকে বুঝায়ে বলি। শীতঘুম তো বোঝেন। শীতের সময় শরীরে পর্যাপ্ত আহার সঞ্চয় করে সাপ শীতঘুমে চলে যায়। ব্যাঙের শীতঘুমের ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে ছিল। আপনি সায়েন্স না? ওকে। তাহলে তো বোঝেনই। সাপ এই শীতঘুমে তিন মাস থাকে। শীতের শুরুতেই গোপন আস্তানায় চলে যায়। তিন মাস পর বের হয়ে আসে। শীতঘুমে থাকা সাপের ওপর একটা ডকুমেন্টারি। গহিন গুহার মধ্যে সাপের বাসায় দিনের পর দিন ক্যামেরা ধরে বসে থাকা। খুব কষ্টের কাজ। সাপের গুপ্ত নিবাস দেখালো। আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে। শীত যাই যাই করছে। সাপের দেহে সাড়া পড়ছে ধীরে ধীরে। একটু একটু করে সচেতনতা আসছে। খুব ইন্টারেস্টিং। ঘুম ভাঙার প্রক্রিয়াটা। মাটির নিচে থেকেই সাপ বুঝতেছে ওপরে তাপ বাড়ছে। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। নড়েচড়ে উঠছে। ফাইনালি, সে বের হয়ে আসবে। এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং। সে যে খালি গুহা ছেড়ে বের হচ্ছে

তা কিন্তু না। একসঙ্গে সে গুহা এবং খোলস দুটা ছেড়েই বের হয়ে আসে। একেবারে নতুন একটা সাপ হয়ে বের হয়। চকচক করে তার ত্বকের কারুকাজ। হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশবাস করে না? আমার কেন জানি ডকুটা দেখতে দেখতে মনে হলো সাপের কাছ থেকে পুনর্জন্মের ধারণাটা আসছে। ক্ষুধার্ত একটা সাপ নবজন্ম নিয়ে গুহা থেকে বের হয়ে আসছে। দৃশ্যটা খুব সুন্দর। রওনক খুব ভীতু। জানেন তো। আচ্ছা আপনি রওনককে অ্যাড করেন না কেন? আজকেই অ্যাড করেন। আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে। ও তেলাপোকা, টিকটিকি, মাকড়সা সবকিছুতে ভয় পায়। এই ভয়টা যদি কাটানো যেত। আর জানেন, আমার ফেসবুক জীবন নিয়ে সে অতিমাত্রায় আগ্রহী। ওর মূল কাজ হলো, সারাদিন ফেসবুকে আমাকে ফলো করা। যাই হোক, সাপের গল্পটা আপনাকে বলার একটা কারণ আছে। শোনেন, আপনার তিন্নি কাহিনী শুনেছিলাম না একদিন। আমার কী মনে হয় জানেন। তিন্নি আপনার জীবনে পাস্ট। পুরনো খোলসের মতো এটাকে ছেড়ে আপনি বের হয়ে আসেন। ইন ফ্যাক্ট শি ইজ নট ইওর টাইপ। ভুলে যাওয়াটা স্বাস্থ্যকর। বোঝেন তো? এখন বয়স অল্প। পুরোটা বুঝবেন না। কিন্তু একটা সময় গেলে ঠিকই বুঝবেন। যখন দেখবেন ভুলে না গেলে আপনি নতুন কোনো কাজ শুরু করতে পারছেন না। দেয়ার ইজ অ্যান অ্যান্ড বিফোর এভরি বিগেনিং। সুপর্ণাকে অনলাইনে দেখে আমার সহসা নওরোজের গল্পটার কথা মনে হয়। বললাম,

হাই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে মুন্না আসে। বলে, আপনেরে হাই ফাইভ দিলাম। আপনে তো উত্তর দিলেন না। কই? কেন সুপারপোক অপশনে। আপনার প্রোফাইলে তো দেখলাম। আপনে সুপারপোক ইউজ করেন। আপনেরে ভালা পাই। শুভ ভাই। ওকে মুন্না। এই হাই ফাইভ মানে কী? লোল। মুন্না হাসে। আমরা হাতে হাতে তালি বাজাই না? ধরো আপনে একটা হাত দিলেন। আমিও একটা হাত দিয়া আপনার তালুতে একটা চাপড় দিলাম। আনন্দ করা। উইন উইন সিচুয়েশন। আমি মুন্নাকে হাই ফাইভ ব্যাক করি।

ইজ ইট ইউ? টেলিং মি হাই?

সুপর্ণা।

কোনো সন্দেহ আছে?

আমি ভেবেছিলাম অন্য কাউকে মনে করে আমাকে হাই বলে ফেলেছো।

কেন তোমার ছবি-নাম দেখে তো নক করলাম।

অনলাইনে আসো না কেন?

তোমার কারণে।

আমি কী করলাম?

তোমার চেহারাটা দেখতে চাই না।

আমি কি খুব বিরক্তিকর। তোমার কাছে অবশ্য বিরক্তিকর হওয়ারই কথা।

এভাবে কথা বলবে না। আমার সমস্যা হয়।

শোনো তোমাকে একটা খবর দেই।

বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছে।

আমার অনামিকায় এখন এনগেজমেন্ট রিং।

কনগ্রাটস।

বাট শুভ, আমি অনেক চেষ্টা করছি।

কী?

কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারছি না।

আমাদের দু'জনের একসঙ্গে থাকা কি সম্ভব ছিল না।

আমি সত্যিই বুঝি না শুভ, তিন্নির কাছে তুমি এত বাঁধা কেন?

আমি সত্যিই বুঝি না।

আমি চোখ বন্ধ করলে তোমাকে ফিল করতে পারি।

তোমাকে স্পর্শ করতে পারি।

সুপর্ণা আজকে কি একবার দেখা হতে পারে?

নো। নেভার। আই কান্ট মিট ইউ এগেইন। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে খুব ভালো একটা ছেলে। দু'তিনদিন ঘুরতে বেরিয়েছি তার সঙ্গে। আমাকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা মুখস্থ শোনায়।

কেউ নতুন করে গলায় কোনো গান তুললে বোঝা যায় না? সে রকম। আমি বুঝি, আমাকে ইমপ্রেস করার জন্যই সে মুখস্ধ করেছে। আমি খুশি। কারণ হি ইজ ট্রাইয়িং। আমারও চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পারছি না।

আই ক্যান হেল্প ইউ টু গেট আউট অব ইট।

নো। ইউ কান্ট। আমি গট টু গো নাউ। বাই।

সুপর্ণা অফলাইন হয়ে যায়।

সুপর্ণা দূরে চলে যাচ্ছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিছু একটা করা দরকার। কী? আমি জানি না। সত্যিই কি তিন্নিকে আমার দরকার। তিন্নির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী? কেন তার জন্য আমার এত আকর্ষণ? আমি বুঝতে পারি, ঠিক এই মুহূর্তে যদি সুপর্ণার কাছে আমি ব্যাক করতে না পারি তাহলে আর সম্ভব হবে না। আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে সুপর্ণার ছবি। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ফেসবুকে অফলাইন হয়ে সুপর্ণার প্রোফাইলে বসে থাকি। ল্যাপটপটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে ঝিম মেরে বসে থাকি। সুপর্ণার জন্য আমার কান্না করা উচিত। কারণ আমি বুঝতে পারি। সুপর্ণা এখন ঘরে বসে একা একা কাঁদছে। অন্য ঘরে তার বাবা বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। যিনি জানেন না, তার মেয়ের জীবনে ময়মনসিংহ কেমন আবেগের একটা শহর হয়ে আছে এখনও। সুপর্ণার সব কথা আমি জানি। সুপর্ণার ত্বকের ভাষা আমি বুঝি। সুপর্ণার বাবার কথা ভাবি। তিন্নির কথাগুলো মনে পড়ে। শুভ শেষ বয়সে আইসা আঙ্কেলকে এইরকম একটা শক দিস না। সুপর্ণা শক্ত মেয়ে। ঠিক সামলায়া উঠবে। তোর দিক থেকে তুই শক্ত থাক। এই বয়সে প্রেম-ভালোবাসা সবই হয়। তার মানে তো এই না যে, ভালোবাসলেই সংসার করতে হবে। দুই দিন দাঁতে দাঁত চাইপা থাক। দেখবি

ঠিকই সে স্বামী-সংসার নিয়া ঘর করতেছে। দোস্ত, বিশবাস হইলো না? ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বাজি লাগ।

আমি বুঝি না। সুপর্ণার কাছ থেকে সরিয়ে আনার জন্য তিন্নি এত উদগ্রীব কেন? ওর স্বার্থটা কী? আচ্ছা ভেতরে ভেতরে তিন্নি খুব স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক না তো? হয়তো মনে মনে হিন্দু-মুসলিম বিয়ে সেই সমর্থন করতে পারছে না।

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তির পরামর্শ মতো নাকি সুপর্ণার বিয়ের কথা শুনে জানি না, ডায়েরি খুলে বসি আমি। খুব চিন্তা করে করে লিখতে থাকি। কেন আমার তিন্নিকে চাই বা চাই না। নিজের কাছেই লজ্জা লজ্জা লাগতে থাকে। এইভাবে লিখে লিখে তো কোনো কিছুর সমাধান করা যায় না। কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টরা এভাবে নাকি লিখতে বলে। তাতে নিজের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত চলে আসে সন্তর্পণে। কিন্তু আজ রাতে আমার তিন্নির বদলে সুপর্ণার কথা লিখতে ভালো লাগে। আমি তিন্নির নামটা কেটে দিই। সেখানে লিখি সুপর্ণা।

যেসব কারণে সুপর্ণাকে আমি বিয়ে করতে পারি :

ক. সুপর্ণাকে আমি ভালোবাসি। সুপর্ণাও আমাকে আমার চেয়েও ভালোবাসে।

খ. সুপর্ণার গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে।

গ. সুপর্ণাকে আমি বুঝতে পারি।

ঘ. সুপর্ণা এস্টাবলিস্ট। ভালো চাকরি করে।

ঙ. সুপর্ণা ভালো গান জানে।

চ. সুপর্ণা সুন্দর, সাবলীল ও সরল।

যেসব কারণে সুপর্ণাকে আমি বিয়ে করতে পারি না :

ক. সুপর্ণা অন্য ধর্মের। আমরা কোর্টে গিয়ে বিয়ে করতে পারি। অথবা সুপর্ণা মুসলিম হতে পারে। এ বিষয়ে সে রাজি। কিন্তু তাতে তার বাবা খুব আহত হবেন।

খ. সুপর্ণার বাবাকে দেখার জন্য সুপর্ণা ছাড়া আর কেউ নেই। তার দিদি আছে বটে। কিন্তু দিদির বাবাকে দেখার সামর্থ্য নেই। সুপর্ণা আমার সঙ্গে চলে এলে তার বাবা সত্যিই খুব শক হবে।

গ. আমার পরিবারে সুপর্ণার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

ঘ. কখনো কখনো আমি তিন্নির প্রতি তীব্র টান বোধ করি। সুপর্ণার এতে সমস্যা নেই। তাকে আমি বলেছি, এই আকর্ষণের কথা। কিন্তু সমস্যা হলো তিন্নি সুপর্ণাকে সহ্য করতে পারে না। ফলে সুপর্ণার সঙ্গে গেলে তিন্নির সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে না।

ঙ. সুপর্ণা রাতে কারো সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাতে পারে না। খুব অস্বস্তি হয় তার।

চ. ...

আর কিছু লিখতে পারি না। সুপর্ণা সম্পর্কে ১১টা পয়েন্ট লেখার পর আমার মনে হয় তিন্নিকে নিয়েও কিছু লেখা সম্ভব। কাল সাবিনা মেহনাজ সুপ্তিকে পয়েন্টগুলো পাঠাতে পারলে উনি হয়তো কিছু সমাধান দিতে পারবেন।

যেসব কারণে তিন্নিকে আমার পছন্দ :

ক. ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা একে অপরকে চিনি।

খ. বিপদে-আপদে তিন্নি আমার খবর রাখে।

গ. সে খুব সুন্দর। লম্বা। স্লিম। তার চোখগুলো আকর্ষণীয়। বলা যায়, সুপর্ণার চেয়েও সেক্সি।

ঘ. সে খুব বাস্তববাদী। স্বাধীনচেতা। কাউকে কেয়ার করে না।

ঙ. সে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আমি তার নিয়ন্ত্রণ এড়াতে চাই। এই গেমটা আমার ভালো লাগে।

চ. তিন্নি আসলে খুব সাহসী।

ছ. এস্টাবলিস্ট। ভালো চাকরি করে। মানুষজনের সঙ্গে ভালো মিশতে পারে।

জ. আমি তাকে ভালোবাসি।

ঝ. তিন্নির পরিবারের সবার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক।

যেসব কারণে তিন্নিকে আমার অপছন্দ :

ক. তিন্নি আমাকে ভালোবাসে না।

খ. তার পছন্দ বড় লোক এবং ভালো ফিগারঅলা লম্বা ছেলে। তার সমান কোনো ছেলেকে সে পছন্দ করে না। সে খুব উচ্চাভিলাষী।

গ. আমার ধারণা সে কখনো কখনো সুন্দর কোনো ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছে।

ঘ. তিন্নিকে আমি বুঝতে পারি না।

ঙ. নিয়ন্ত্রণ প্রবণতা কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

চ. তিন্নি কখনো তার হাত পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেয় না আমাকে।

ছ. তিন্নি আসলে কী চায়, কীসে খুশি হয় আমি জানি না।

জ. কিপটা।

ঞ. শি ইজ নট মাই টাইপ।

এই তালিকাটা শেষ করা মুশকিল। তিন্নির বিরুদ্ধে আমার অভিযোগের শেষ নেই। ঘটনা ধরে ধরে বললে বিশাল একটা উপন্যাস হয়ে যাবে।

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তি, আপনাকে বিশবাস করে আমার একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যগুলো পাঠালাম। আপনি এগুলো বিশ্লেষণ করে আপনার মতামত জানাবেন। কেন যেন আমার মনে হয়, আজকালের মধ্যে সিদ্ধান্তে আসাটা আমার জন্য জরুরি। সাবিনা মেহনাজের মেইলে তথ্যগুলো পাঠিয়ে সারাদিন বসে থাকি আমি।

ছিল উচাটন উট ছিল তানপ্রধান রেডিও আমরা শুনছিলাম

সাবিনা মেহনাজের চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার মনে হয়। জীবনের এই সংকটময় সময়ে আমার উচিত ফয়সল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা। মোবাইলে ফয়সল ভাইয়ের নাম্বারটা খুঁজলাম। খুব অবাক করা ব্যাপার। নিত্যপ্রয়োজনীয় এ নাম্বারটা ফোনে নেই। কেমনে এটা হলো? আমি কি ভুলে নাম্বারটা ডিলিট করেছি? মনে করতে পারছি না। গত ছয় মাসে সুপর্ণার সঙ্গে দিন-রাত কাবার করা কিছু সময় গেছে। এর মধ্যে আমি কাজ করেছি নাকি খেয়েছি না কোথাও গেছি আমার মনে পড়ে না। সম্ভবত গত ছয় মাসে ফয়সল ভাইকে একবারের জন্যও ফোন দেয়া হয়নি। মে বি। হয়তো

উনি একবার দু'বার দিয়ে থাকবেন। ঠিক মনে নেই। একটা ব্যাপার হতে পারে। এই ছয় মাসে একবার আমার হ্যান্ডসেট বদল হয়েছে। হয়তো আগের হ্যান্ডসেটে ফয়সল ভাইয়ের নাম্বার সেভ হয়ে ছিল। সেট বদল করার সময় সিমের সঙ্গে নাম্বারটা আসেনি। কিন্তু উনি ফোন করলে তো নাম্বারটা থাকার কথা। তার মানে উনি অনেকদিন আমাকে ফোন করেন না। শুধু ফেসবুকের ওয়ালে কমেন্ট করেন। কিন্তু যদি কোনোভাবে উনি বুঝতে পারেন, আমার সেটে তার নাম্বার নেই তাহলে খুব মর্মাহত হবেন। আমি তাকে একটা মেসেজ দেই, ফেসবুকে। ফয়সল ভাই। কল মি অ্যাট ওয়ান্স। আরজেন্ট। নো ব্যালান্স অন মাই সেল।

অনলাইনে ছিল ফয়সল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল।

নাম্বারটা আসলেই ফোনে নেই। বললাম, ভাই আবারও তিন্নি বিষয়ক জটিলতা। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এত সুন্দরী মেয়ের এখনও বিয়ে হয় না কেন বুঝলাম না। ওই পার্ট তুমি শেষ করতে পারো নাই? এক কাজ করো। সন্ধ্যায় এনামে আসো। বিয়ার খেতে খেতে কথা বলব। ওকে?

ফয়সল ভাই হস্তরেখা বিশারদ। লম্পট ব্যক্তি। প্রতি সন্ধ্যায় বিয়ার সহযোগে আহার সারেন। নিদ্রা যাওয়ার আগে আর কিছু খান না। এনাম রেস্টুরেন্ট ও বার তার প্রিয় এলাকা। বড় লম্বা সাইজের অ্যাটলাস বিয়ার খান প্রতি সন্ধ্যায় চারটা। ঘুমান রাত তিনটায়, ওঠেন ছয়টায়। অ্যাটলাস না পেলে হ্যানিকেন খান। অস্ট্রেলিয়ান ভল্লুক বলেন এইটারে। পরিকল্পনা কমিশনে চাকরি করেন। আমি সন্ধ্যা বেলা এনামে গিয়ে দেখি টু সিটেড একটা টেবিলে বসে আছেন। সামনে দুইটা চিলড অ্যাটলাস।

আমাকে দেখে, মুখ তুলে বসতে বলেন। কী নিবা? বিয়ার নিবা নাকি হুইস্কি। চামচ দিয়ে গ্লাসে আওয়াজ তুলে বেয়ারাকে ডাকেন। কী নিবা বলো? আমার কোনো আইডিয়া কাজ করে না। তাই বলি অ্যাটলাস।

ফয়সল ভাই বলে, ওকে দু'চিলড অ্যাটলাস। আরও দুইটা ফ্রিজে ঢুকাও। পেঁয়াজ-মরিচ দিয়া মাখায়ে ছোলা দিয়ে যাও। বিয়ারের সঙ্গে বিফ ভুনা আর নান আনবা। বেয়ারা চলে গেলে ফয়সল ভাই আমার দিকে মনোযোগ দেয়। বলো, শুভ। ওয়েট। কী বলবা? পুরানা গল্প শুনতে ভালো লাগে না। বললে নতুনভাবে বলতে হবে। বলো।

তিন্নির গল্প নতুন করে কীভাবে বলব বুঝতে পারি না। ভাবতে থাকি। একটা অস্বস্তি হয়। গল্পের মধ্যে একটা টুইস্ট আনতে হবে। নইলে ফয়সল ভাই শুনবে না। সমাধানও দেবে না। গল্পটা কোথায় শুরু করব চিন্তা করতে করতে ফয়সল ভাই বলে তোমার হাত দুইটা পাতো। আমি হাত পেতে ধরলে ফয়সল ভাই মোবাইলের আলো জ্বেলে হাতের রেখা পর্যবেক্ষণ করে। তুমি আগে কখনো আমাকে হাত দেখিয়েছো? দেখাও নাই? ওকে তুমি জানতা না যে, আমি একজন পামিস্ট? শোনো, তোমার জীবনে যা ঘটে যা ঘটবে সবই এই হাতের রেখায় লেখা আছে। কাউকে কখনো হাত দেখিয়েছো?

ফয়সল ভাই, ইন ফ্যাক্ট আমি এসবে বিশবাস করি না।

শোনো বিশবাস আমিও করি না। এটা বিশবাসের ব্যাপারও না। কিন্তু তোমার জীবনে যা ঘটছে তা ধরো কোথাও লেখা আছে বলে শুনলা। ধরো এ কথাটা তোমাকে কেউ এসে বলল। ধরো একজন এসে তোমাকে বলল, তোমার জীবনে যা ঘটেছে এবং যা ঘটবে তা সুইজারল্যান্ডের লাইব্রেরির একটা বইয়ে লেখা আছে। তুমি কী করবা? ওই বইটা পড়ে দেখার ইচ্ছা করবে না তোমার?

করবে।

ওকে। সুইজারল্যান্ড কেমনে যাবা?

সুইজারল্যান্ড কেমনে যাবা? নিশ্চয় তুমি ভাবছো, রিয়েলি সুইজারল্যান্ড কেমনে যাবা। তুমি কিন্তু বইটা সম্পর্কে ডিটেইল কিছু জানো না। জাস্ট শুনছো যে ওই বইটায় তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ লেখা আছে। এখন ধরো, আমি বললাম সুইজারল্যান্ড যেতে হবে না। বইটা আমার কাছে আছে।

আছে?

ইয়েস। এখানেই আছে।

ইন্টারেস্টিং।

এই যে, বইটা আমরা সামনে খোলা। তোমার দুই হাতের দুইটা পাতা, সেই বইয়েরই দুইটা পাতা। লেটস ট্রাই টু রিড।

এই ফয়সল ভাই। আমি বললাম, ফয়সল ভাই, সুপর্ণার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

এটা কে? নতুন ক্যারেক্টার?

কাহিনীতে টুইস্ট আসছে। গুড। শুরু করো।

আমি শুনতে শুনতে তোমার রেখাগুলো স্টাডি করে নেই।

আমি বলতে শুরু করতেই দুটো বিয়ার আর এক প্লেট ঝাল ছোলা নিয়ে বেয়ারা আসে। শফিক, তাড়াতাড়ি নান-বিফ নিয়া আসো, বেয়ারাকে অর্ডার দেন ফয়সল ভাই। তিনি একটা বিয়ার খুলে বিয়ারের ক্যান আর গ্লাস দুটোই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হেলিয়ে সুকৌশলে গ্লাস ভরে বিয়ার ঢালেন। এই বিষয়ে ওনার দক্ষতা আমাকে অবাক করে দেয়। আমি চুমুক দিতে দিতে সুপর্ণার গল্প শুরু করি। ফয়সল ভাই বলেন, এক কাজ করো। তোমার তাড়া আছে? তাড়া না থাকলে ডিটেইলে বলো। উপন্যাস পড়েছ কখনো? ওকে গুড। উপন্যাসের মতো করে বলো। ধরো শৈশব থেকে শুরু করলা গল্পটা। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে আসলা। তোমার সঙ্গে সুপর্ণার দেখা হলো। কীভাবে কী হলো সব বলো।

ফয়সল ভাই, ঘটনাটার শুরু পিংক সিটিতে। জয়পুরে।

ইনডিয়া? ওকে গুড। লং টুরে গিয়েছিলে। বেশ। বলো।

সুপর্ণার সঙ্গে দ্বিতীয় দফার যোগাযোগের শুরুতে, মানে যখন ময়মনসিংহ যাওয়া বাতিল হলো। তিন্নির চোখ এড়িয়ে ফেসবুকে ওর সঙ্গে আমার রেগুলার যোগাযোগ শুরু হলো তখন একদিন সুপর্ণা বলে, এভাবে ভালো লাগে না। কোথাও বেড়াতে

যাওয়া যায় না? দূরে কোথাও? শুধু তুমি আর আমি। ধরো মাইলের পর মাইল জনমানুষ নেই। শুধু আমরা দু'জন। সে রকম কোথাও যাওয়া যায় না?

সুপর্ণাকে নিয়ে সত্যিই কোথাও যাব এ চিন্তা তখনো আমার মনে ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম আমি। বললাম, এখনই চলো।

এখনই চলো মানে কী?

এই যে কল্পনায় উড়াল দিয়ে চলো তো ঘুরে আসি কোথাও।

যাহ, এটা সম্ভব নাকি?

সম্ভব। ধরো...

আমি ধরতে পারব না। সত্যি সত্যি চলো একদিন।

ঠিক আছে সত্যি সত্যি যাব একদিন। কিন্তু এখন চলো। কল্পনায়।

সুপর্ণা অবশেষে কনভিন্সড হয়। বলে, ধরলাম।

শক্ত করে ধরো।

আচ্ছা তোমার কী ভালো লাগে? পাহাড়, বন, নদী না সাগর?

এখন এসবের কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।

চলো তাহলে মরুভূমিতে যাই। রুক্ষ, শুকনো মরুভূমিতে চলো।

কোথায়? জয়পুর। রুক্ষ মরুভূমির বুকে প্রাচীন শহর পিংক সিটি।

গেছো কখনো?

না।

আমিও যাইনি।

তাহলে চলো কল্পনা করি।

জানো, পুরনো বাড়িগুলো আমার খুব ভালো লাগে। ময়মনসিংহে আমরা যে বাড়িটাতে থাকতাম। সেটা একশ' বছরের পুরনো ছিল। সেই বাড়িটাতে নাকি ভূত থাকত। আমরা একদম ভয় পেতাম না। পুরনো বাড়িতে থাকার একটা অন্যরকম আনন্দ আছে। মাঝে মাঝে কী মনে হতো জানো, আমি যেন সুপর্ণা না। কোনো এক পুরনো জমিদারের মেয়ে। কিন্তু ভাবো, ইংরেজদের তৈরি করা পুরনো বাড়িতে জমিদার আসবে কোত্থেকে। বড় জোর কোনো সরকারি কর্মকর্তা ছিল এখানে। তবু মনে হতো। তুমি ময়মনসিংহ গেলে বাড়িগুলো দেখলেই বুঝতে এগুলো তেমন বাড়ি নয়। আচ্ছা জয়পুর কি তেমন মরুভূমি? ধরো একেবারে সাগরের মতো মরুভূমি। দূর থেকে যাকে দেখলে তুমি সাগর বলেই ভুল করবে।

তেমনি তো। তবে উটের জাহাজ আছে। রুক্ষ মরুভূমির মাঝে মাঝে শহর। অনেক দূরে দূরে। উঁচু দেয়াল। আর বড় বড় গেট। রাতের বেলা এখনও সে মরুভূমির বুকে চরে বেড়ায় মহারাজা জয় সিংয়ের সৈন্যরা।

প্রথমে তো দিল্লি যেতে হবে, তাই না?

জানি না। তবে ধরো, সন্ধ্যা বেলা। এক পাগড়ি পরা লম্বা জোব্বার এক লোকের কাছে জেনে আমরা ছোট একটা শহরে নেমে পড়েছি। ছোট একটা রেলস্টেশন। কী নাম তাও ভুলে গেছি ধরো।

ধরলাম।

এখান থেকেই আমি ফয়সল ভাইকে গল্প বলতে শুরু করি।

সুপর্ণা আর আমি একটা গুমনাম আনজান রেলস্টেশনে নেমে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম আরও দু'দশজন আমাদেরই মতো একেবারে অচেনা দেশের ঘোর কাটাতে ব্যস্ত। এক পাগড়িঅলা এসে বলল, আপনারা কি জয়পুর যাবেন? এ সন্ধ্যায় শেষবারের মতো আমাদের উটের ট্রিপ জয়পুর যাবে। গেলে তাড়াতাড়ি করুন। একবার জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ লাগবে। লোকটা বলল, আজ তো পূর্ণিমা। আজ জয়পুরে উৎসব হচ্ছে। কোনো সমস্যা নেই। আকাশে চাঁদ আছে। মরুর বাতাস শীতল হয়ে আসছে। জয়পুর পৌঁছে আপনারা ঠিকই উৎসবে যোগ দিতে পারবেন। যে কয়জন ছিলাম স্টেশনে সবাইকে জড়ো করে একটা একটা উটের পিঠে সওয়ার করে দিলো ওরা।

একটার পিঠে আমি আর সুপর্ণা। প্রথমে উঁচু-নিচু গতির উটের পিঠে উঠে দু'জনেই ভয় পেয়ে গেলাম। সুপর্ণা আমাকে আঁকড়ে ধরল। মরুর বালুতে নামতেই উটের চলার গতিটা চেনা হয়ে গেল। আমি বললাম সুপর্ণা চাঁদ কোথায়?

সুপর্ণা অবাক হয়ে যায়, বলে আসলেই তো চাঁদ কোথায়?

ওই যে ওই পাহাড়ের আড়ালে। এখনও উঠছে আকাশে। পুরোটা উঠতে পারেনি।

কেমন লাগছে?

খুব ভালো। জানো আমি কখনো উটের পিঠে উঠিনি। এত ভালো লাগছে। আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে হারিয়ে যাওয়া চাঁদটাকে খুঁজতে।

তুমি বলো তো ভরা জ্যোৎস্নার মধ্যে মরুভূমিটা দেখতে কেমন?

আমরা ভাবছি, একটা পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ। উট তো সেই পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছে। ওই পাহাড়ের কাছে এসে দেখা গেল চাঁদ আসলে তার পরের পাহাড়ের পেছনে। আমরা সে চাঁদের দিকেই যাচ্ছি। চাঁদ না দেখলেও তার আলো আভা কিন্তু ঠিকই ঠিকরে পড়ছে মরুর বালুতে। কেমন লাগল মরুর বালু?

কেমন?

চিকচিক করছে।

দূর থেকে একটা পাহাড়ের ঢালের দিকে দেখো। মনে হবে উজ্জ্বল রুপালি একটা নদীর বাঁক।

ওয়াও! সুপর্ণা বিস্ময় প্রকাশ করে।

এত সুন্দর! দারুণ!

বাতাসের গন্ধটা কেমন?

কেমন?

তুমি বলো।

না তুমি বলো।

উঁহু, তুমি বলো।

আমার জোরাজুরিতে সুপর্ণা বলতে থাকে। বাতাসের গন্ধ। বাতাসের গন্ধ। প্রথম বৃষ্টির পর একটা ভ্যাপসা গরম গন্ধ ওঠে না মাটি থেকে, বাতাসের গন্ধ অমন।

নাইস। একেকটা রুপালি নদীর স্রোত অতিক্রম করে আমরা যাচ্ছি চাঁদের দিকে। জয়পুর। সেখানে পিংক সিটি আছে। সেখানে ঝলমলে আলোর নিচে নাচছে জয় সিংহের দরবারের কোনো এক নর্তকী। শত শত বছরেও মরে না এমন চিরযৌবনা নর্তকী।

ওদের জন্য খুব লোভ হচ্ছে?

না। লোভ হবে কেন? তবে ওদের নৃত্যের কলা দেখতে ইচ্ছা করছে।

নাচ কিন্তু আমিও জানি।

তাই তো বলি তোমার বিভঙ্গগুলো এত কথা বলে কেন?

কী বলে?

কত কিছুই তো বলে।

হঠাৎ একটা ছোট গ্রাম পড়ল। ঘরগুলো সব মাটির। ছোট ছোট জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট আলো।

হঠাৎ করে আবার মরুভূমি শুরু হলো। গ্রামটাকে একটা বিভ্রম বলে মনে হলো। মনে হলো, আসলে পথে কোনো গ্রাম পড়েনি। ওটা আসলে কোনো গ্রাম ছিল না। ঘরগুলো ছিল ছোট ছোট ঝোপ। আলোগুলো ছিল জোনাক পোকা।

ওখানেও জোনাক আছে? একদিন তোমাকে জোনাক পোকা নিয়ে একটা গল্প বলব। আজ না। আজ জয়পুরের গল্প খুব ভালো লাগছে।

গল্প? কেন আমি আর তুমি উটের পিঠে করে যাচ্ছি। স্পর্শ করছি তোমার শরীর। তুমি অনুভব করতে পারছ না? আমি কল্পনা করছি নৃত্যরত অবস্থায় তোমার বিভঙ্গ, তুমি কি লজ্জা পাচ্ছো না? শোনো তুমি হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠলে। তাকিয়ে দেখলে আমরা যেদিকটা ফেলে এসেছি, সেদিকে একটা শহরের আলো। অনেক দূরে। শহরের আলো। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, ঠিক পেছনে ফেলে আসা শহর নয়, শহরটা আচানক আমাদের সামনে এসে পড়েছে আর শহরটাই আমাদের গন্তব্য।

কে একজন একটা উট থেকে চিৎকার করে উঠল। পিংক সিটি।

তুমি চিৎকার করে উঠলে, বললে, দেখলে পিংক সিটি।

আনন্দে তুমি জড়িয়ে ধরলে আমাকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম।

কেন এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে কেন?

হঠাৎ মনে পড়ল, তুমি তো আমাকে অত ভালোবাসো না। তুমি তো আসলে তিন্নিকে ভালোবাসো।

তিন্নিকে ভালোবাসলে কি তোমার সঙ্গে এতদূরে ভারতের এই প্রান্তে এসে পড়েছি।

এখন আর আমি মরুভূমি দূরের শহরের কাছে আসার দৃশ্য, এমনকি হেলতে-দুলতে চলা উট কোনো কিছুর কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি তোমার চকিত আলিঙ্গনের কথা। এমন হঠাৎ স্পর্শ মানুষকে তাৎক্ষণিক পাগলে পরিণত করে দেয়।

ইস! ভীতুর ডিম কোথাকার। এত যদি স্পর্শের কাঙাল...

শোনো আমাদের উট এসে থামল একটা জলসার ধারে। গান চলছে। আর সত্যিই শত শত বছরের পুরনো চিরযৌবনা এক নারীর নৃত্যলহরী। কেউ দীর্ঘ লয়ে একটা রাগ ক্রন্দনের সুরে গাইছে।

কী রাগ?

দরবারী।

দু'জনে তন্ময় হয়ে শুনছি সে গান। যাত্রার ক্লান্তি যেন নৃত্যরত সুন্দরীর বিভঙ্গে হারিয়ে গেল।

ফয়সল ভাই, হুঁ। বলে যাও।

আমি আর সুপর্ণা একটা পিংক রঙের বাড়িতে উঠলাম। ছোট মাটির বাড়ি। কাপড় বদলে নিচে নেমে হোটেলে খেলাম। জয়পুরের মশলা দেয়া বিখ্যাত পান মুখে দিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত পার হয়ে গেল। সুপর্ণা বলে রাতে তো ঘুম আসে না। চলো ছাদে যাই। ছাদ বলতে তিনতলা মাটির ঘরের সামনে খোলা বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম স্বপ্নের শহর জয়পুর।

চাঁদ তখন মাঝ আকাশে। পূর্ণ আলো ফেলেছে সব শহরে। তার বিভা মরুর বুকে একটা গোলাপি ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে। ছোট ঘরগুলো সে গোলাপি ফুলের একেকটি পাপড়ি। এখন পুরো শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। নৃত্যলহরীর সঙ্গে আসা গান থেমে গেছে। ছোট নির্জন ছাদে আমি আর সুপর্ণা।

সুপর্ণা, তুমি কি একটা গোপন সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছো?

না।

ভালো করে শোনো। শহরের চারদিকে এক গুঞ্জরণ? কান পাতো।

সুপর্ণা কান পাতে ছাদের একদিকে যায়। আমি শুভ্র শাড়িতে সুপর্ণার অনাবৃত গলায় পড়া চাঁদের আলো দেখি। বলি, শুনছো?

হ্যাঁ।

কী গান?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভালো করে শোনো।

আমি গুনগুন করতে থাকি। গগনে গগনে আপনারো মনে কী খেলা তব।

সুপর্ণা বলে সত্যি। এই গান। এই গানটাই।

সুপর্ণা দেহে একটা হিল্লোল তোলে গগনে গগনে ছড়িয়ে পড়া অনাশ্রুত সঙ্গীতের তালে তালে।

আমি তার কাছে যাই।

আমি এখন তোমার অত্যন্ত নিকটে।

কাছে এসো না।

কেন?

তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না।

বাসি।

সত্যি।

হু।

আসি কাছে?

সুপর্ণা লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, খাচ্চর। আমার ঘুম পেয়েছে। বাই।

আমার গল্প তখনো চলতে থাকে। ফয়সল ভাইয়ের চোখ লাল হয়ে আসে। রাত ঘন হয়ে আসে। পরপর চারটা অ্যাটলাস শেষ করে আমি আর ছয়টা অ্যাটলাস শেষ করে ফয়সল ভাই এনাম থেকে বের হয়ে আসি।

লেট মি থিংক সামডেইজ মোর।

ফয়সল ভাই কয়টা দিনের সময় নিয়ে চলে যায়।

কয়েকটা ঘটনা পরপর আসে। নাজিয়া একটা মেইল দিয়ে বলেছে, শুভ আমি খুব স্বার্থপর। সবসময় নির্লজ্জের মতো নিজের কথাই বলে যাই। তোমার কথা কোনোদিন শুনি না। খুব ঘুম পেয়েছে। তাই আজ ঘুমাব। কিন্তু ঘুমানোর আগে মনে হলো তোমার কথাও কিছু আমার শোনা উচিত। আচ্ছা তুমি নিজের কথা কখনো বলো না কেন? তুমি এমন কেন বলো তো।

জীবন এসে সহসা নক করে, শুভ ভাই। একটা অনুরোধ করি?

করেন।

সোজা বেসিনে গিয়ে চোখে পানি দিয়ে আসেন। থেকে থেকে চোখ কচলাবেন। এখনও চশমা নিতে হয় নাই রে ভাই। আপনি মহাভাগ্যবান। আমার মতো চশমা নিয়ে কাজ করতে হলে বুঝতেন। শোনেন, আমি অনলাইনে বসে থাকলাম। আপনি চোখে পানি দিয়ে এলে আপনাকে ছাড়ব।

জীবনের চাপে বেসিনে গিয়ে চোখে পানি দিয়ে ফিরলাম। জীবনকে জানালে, সে থ্যাংকস জানিয়ে চলে গেল।

তিনদিন পর ফয়সল ভাই দুপুরে ফোন দেয়। বলে, তুমি তো তুলা রাশি তাই না? তুলা রাশির মূল সমস্যা কী জানো? নিজের সমস্যা নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করা। এটা খারাপ কি ভালো সেটা আমার বক্তব্য না। তুমি শুধু একটা তথ্য জেনে রাখো। তুলা রাশি সবার সঙ্গে এভাবে আলোচনা করে কেন? আলোচনা করে, কারণ কাজ না হলে যাতে নিজের ওপর দায় না নিয়ে সে অন্য কারো ওপর চাপাতে পারে। এখন ধরো আমি তোমাকে বললাম এই কাজটা করো। তুমি তো চৌদ্দজনের কাছ থেকে চৌদ্দরকম সাজেশন নিয়ে বসে আছো, তাই না? যে কোনো একটা লাগবে, অথবা সব কয়টা ফেইল করবে। ফেইল করলে তুমি আমাদের ওপর দোষ চাপাবা। আর ফললে তো পোয়াবারো। শোনো তোমাকে একটা কঠিন কাজ দেব। তুমি তিন্নিকে মিট করবা

আজকে। তিন্নিকে মিট করে বলবা, ইউ ওয়ানা কিস হার। বলবা, নইলে তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব থাকবে না। আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না। জাস্ট মিট হার অ্যান্ড সে ইট। গট মাই পয়েন্ট। ওকে, গুড বয়। ইউ জাস্ট মিট অ্যান্ড সে দ্যাট অ্যান্ড লেট মি নো হোয়াট হ্যাপেনস নেক্সট।

তারপর সাবিনা মেহনাজ সুপ্তির সেই প্রতীক্ষিত ই-মেইল। দীর্ঘ একটা চিঠি লিখেছে।

শুভ,

চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি চ্যাটবক্সে শোনা কথাগুলো থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। কিন্তু অনেক দিন একটু একটু করে শোনার পর আমি আপনার পরিস্থিতি কিছুটা বুঝতে পারছি। আর আপনার দীর্ঘ মেইলটা আমি পেয়েছি। আপনি সুপর্ণা ও তিন্নি সম্পর্কে আপনার যে মূল্যায়ন লিখেছেন তা আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছি। আপনার অকপট অনুভূতির কথা লিখেছেন আর আমাকেও নিশ্চিন্তে তা পাঠিয়েছেন এটা ভেবে খুব আনন্দ হলো। আপনি যে সমস্যায় পড়েছেন তা আমার কাছে কিছুটা অচেনা। আমার অভিজ্ঞতার পরিসর খুব সীমিত। বাইরের পৃথিবীর কামনা-বাসনার তেমন কোনো কাহিনী আমি জানি না। আমার অভিজ্ঞতা কিছুটা টেক্সুয়াল। বই পড়ে কিছু ধারণা আমি পেতে চেষ্টা করি। কিন্তু এখনকার একজন তরুণ কোনো ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আপনার সমস্যা কথা শুনে আমি যে কিছুটা বিস্মিত হইনি তা নয়। কিন্তু কিছু ঘটনা আমারও জানা। আমি নিঃসন্তান। বাসার বারান্দার গাছগুলো আমার সন্তান। আমাদের বিল্ডিংয়ের ছেলে-মেয়েরা আমাকে তাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখে। তারা অনেকদিন আমাকে তাদের সমস্যার কথা আমাকে বলেছে। আমি তাদের সমস্যা শুনতাম কিন্তু তেমন কোনো সমাধান দিতে পারতাম না। সমাধান দিলেও তাদের ঠিক কাজে আসত না। আপনার কাহিনী শুনে বুঝতে পারছি, আপনার আর আমার মাঝে একটা জেনারেশন গ্যাপ আছে। আপনার মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়েছে আর যেভাবে অকপটে আপনি আমাকে তা বলেছেন তাতে আমি বেশ বুঝতে পারছি মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যবধানটা কত বড়। আমি বয়সে আপনার থেকে হয়তো খুব বড় নই। তারপরও একটা গ্যাপ অনুভব করছি। যা-ই হোক, বড়ত্ব ফলানোর কোনো দরকার নেই। বরং কাজের কথাগুলো বলে নিই।

আপনি সম্পর্ক নিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং সুপর্ণা ও তিন্নির সম্পর্কে আপনার যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে যে কেউ কনিফিউজড হয়ে যাবে, কে আপনার প্রকৃত প্রেমিকা। বস্তুত কার প্রেমে আপনি পড়েছেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। আমরা যারা প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে গানটি শুনলে চোখ বন্ধ করে ফেলি তাদের কাছে বহুদিন ধরে এ ঘটনাটি একটি প্রতারণার মতো ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু আমি বুঝি, জীবনটা নানা কো-ইন্সিডেন্সের পরিণাম। প্রেম-ভালোবাসা বলুন আর পারিবারিক আলাপ-আলোচনার পরিণামে বিয়েই বলুন একটা না একটা সময় আপনি দৈবচয়নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আপনাকে লটারির টিকিট কেনার মতো

করে বেছে নিতে হয়। এই বেছে নেয়ার ভিত্তিতেই আপনার পরবর্তী জীবনের আকার নির্ধারিত হয়ে যায়। যে কোনো কারণেই হোক আপনি তিন্নিকেই আপনার জীবনের সঙ্গী হিসেবে মনে মনে ভেবে নিয়েছেন। ভাবুন, আপনার ক্যাম্পাস জীবনের কথা। হয়তো, অনেকেই সে সময় আপনার পাশে ছিল। কিন্তু তিন্নিকেই আপনি বেছে নিয়েছেন। দীর্ঘ সময়ের বন্ধুত্বে আপনার মনে তিন্নির সম্পর্কে জানা-অজানার একটা রহস্যময় ধারণা তৈরি হয়েছে। চেনা ব্যাপারগুলো ক্রমেই অচেনা হয়ে গিয়েছে। আপনি তার সম্পর্কে এমন এক ধারণা তৈরি করেছেন মনে মনে যে, সে অনেক দিনের চেনা হয়েও তার সোকলড রহস্যময়তা তাকে অচেনা করে রেখেছে। আপনিও তাকে আর ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তিন্নিও রহস্যময় কোনো কারণে তার জীবন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। যা-ই হোক, ইতিমধ্যে আপনি তিন্নির মাধ্যমেই সুপর্ণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তার সঙ্গে আপনার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং তিন্নির প্রভাবেই এ সম্পর্কটি ভেঙে গেছে। অর্থাৎ আপনার জীবনে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর আসলে তিন্নি। আমার মনে হয়, আপনি সুপর্ণার মধ্যে তিন্নিকেই আসলে খুঁজেছেন। না খুঁজলেও এটা ছিল একটা রিলিফ। তিন্নির জন্য আপনার ক্লান্তিকর অপেক্ষার ফাঁকে বিজ্ঞাপন বিরতির অবসর।

আমি ঠিক মতামত দিতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, সার্বিক পরিস্থিতিতে সুপর্ণার কাছে ফিরে যাওয়া আপনার জন্য সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা হবে না। আমি নিশ্চিত না, আপনি তিন্নির সঙ্গেও সুখী হতে পারবেন কি-না। তবে আমার পরামর্শ হলো, আপনি তিন্নির সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন। সে আলোচনা সিরিয়াস পরিবেশে করুন। দরকার হলে ঢাকার বাইরে কোথাও গিয়ে সময় নিয়ে কথা বলুন। খোলা মনে কথা না বললে সমস্যাটির কোনো সমাধান হবে না।

আপনার জন্য শুভকামনা। নিশ্চয়ই আপনি সুখী হবেন। একটা ব্যাপার মনে রাখুন। জীবনের জন্য অনিবার্যতা বলে কিছু নেই। সবই নিবারণযোগ্য।

সুপ্তি।

হলুদ নদীর জলে চাঁদ দেখে মনে হলো

ভাবতে পারছিলি?

কী?

ওই যে তোকে বলছিলাম না।

কী?

ওই যে কোনো একজন প্রেমিক খুঁজে নিতে। কারো সঙ্গে লাভ মেকিং করতে।

তুই কি আমার সতীত্ব নিয়ে খুব চিন্তিত? আচ্ছা তুই আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দে তো। এই যুগে তোদের জ্বালায় কোনো মেয়ে কি সতীত্ব নিয়া শান্তিতে থাকতে পারবে না। সতীত্ব কি একটা দোষ?

আমি অবশ্য সিওর না যে তুই এখনও ভার্জিন আছিস কি-না।

গুড। আমি তোর কাছে পরীক্ষাও দেব না। শোন ফালতু কথা রাখ। কেন ফোন করছিস বল।

আচ্ছা টিন, বল তো শেষ কবে আমরা ঘুরতে গেছি। শেষ করে ঢাকার বাইরে গেছি।

এসব পুতুপুতু ফালতু কথা বলার জন্য ফোন করছিস? তুই কি পর্যটন কর্পোরেশনে কাজ নিছিস নাকি। নাকি বায়িং হাউস ছেড়ে ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাম নিছিস। ঢাকার বাইরে যাওয়া মানে কী? এসব ফালতু আইডিয়া তোরে কে দেয়। আচ্ছা বন্ধু আমারে বল তো। নতুন কইরা আমারে পটানোর কোনো ধান্দা আঁটছো নাকি। বল বল। বলে ফেল।

আমি একটু থমকে যাই।

একবারে ফালতু একটা মেয়ে। নিজের অবস্থান নিয়ে সদাসতর্ক। কোনো স্পেস দেবে না।

আমি বললাম, বন্ধু, তুমি আমারে ভুল বুইঝো না। আমি জানি, আমি বুঝায়ে কোনোদিন তোমারে রাজি করাইতে পারব না। সো তোমার যদি কোনো দিন মনে হয় তাইলে তুমি বইল। আমি আর কোনোদিন তোমারে বলব না। আমি তো তোমারে বলছি, তুমি পছন্দমতো একটা ছেলেরে বাইছা নেও। তারে যদি ভালো লাগে তার সঙ্গে ডেটিং করো। তারে বুঝো, তার মনমানসিকতা বুঝার চেষ্টা করো। দেন, তারে বিয়া করো। কোনো সমস্যা নাই। তুমি তো সেটাও করতে পারতেছো না।

তিন্নি একটু সিরিয়াস হয়। আমি আসলে কী চাই বলো তো?

সেটা তো তোমার ভালো জানার কথা। আমার তো মনে হয় তুমি ভালো করে জানো তুমি কী চাও।

আচ্ছা বল তো আমাকে কী তোর অতিরিক্ত চালাক মনে হয়? মানে আমারে কি তুই ধূর্ত মনে করিস?

ধূর্ত না। তবে আমার মনে হয়, তুই কনফিউজড। মানে কী চাস তুই জানিস না। কী করা উচিত সে সম্পর্কে তোর স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।

তিন্নির সঙ্গে ফোনালাপ ক্রমাগত দীর্ঘতর হতে থাকে।

আচ্ছা শোন। একটা দরকারি কাজে আসলে ফোন দিছি তোকে। নোমান ভাইকে চিনিস? ওই যে টঙ্গীর নোমান ভাই। তোর সঙ্গে একবার পরিচয় হইলো না? গাউসিয়াতে। ওনার বউয়ের জন্য শাড়ি চুজ কইরা দিলি না? সেই নোমান ভাইয়ের সঙ্গে কালকে ফেসবুকে দেখা। উনি তোর কথা জিগাইলো। তোরে শুভেচ্ছা দিতে কইল।

তাইলে এখন বল যে, নোমান ভাইয়ের শুভেচ্ছা দেওনের জন্য তুই আমারে ফোন দিছস। বল, বইলা ফেল।

আসলে সেটা না। নোমান ভাই একটা অদ্ভুত কথা কইল। আচ্ছা তুই বল তো ঢাকার কাছে নাকি একটা পাহাড় আছে। সাভারের দিকে। তুই জানিস?

সাভারের দিকে পাহাড়? জীবনেও তো শুনি নাই। প্লেইন ল্যান্ডে পাহাড় আসবে কেমনে। নোমান ভাই ধাপ্পা দিছে।

নোমান ভাই কিন্তু ধাপ্পা দেয়ার লোক না। উনি কইল সাভারের কাছে নাকি একটা পাহাড় আছে। সাভার বাসস্ট্যান্ড থিকা রিকশা কইরা রাজাশন যাইতে হয়। রাজাশন থিকা নাইমা মেলা দশ কিলো পথ হাঁটতে হয়। দেন, একটা ঘন জঙ্গল পড়ে, সেই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়। এখনও উপরে ওঠার সিঁড়ি বলতে কিছু তৈরি হয় নাই। তবে পাহাড়ে উঠতে পারলে নাকি বিশাল বিস্ময়। পাহাড়ের চূড়ার ঠিক মাঝখানে একটা লেক। ঢাকার এত কাছে পাহাড়ের মাথায় একটা বড় লেক। চারদিকে বাঁশঝাড়ে হাজার হাজার বকপাখি। হাজার হাজার শাদা বকপাখি। আমি ভাবতেছি একদিন সাভার যাব। ট্রেকিংয়ে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

আমারে কেন? তোর সুপর্ণা আছে না?

আমি চুপ হয়ে যাই।

সুপর্ণা নামে কাউরে মনে হয় চিনিস না? কোন সুপর্ণা, জিগা। ওই যে আমার এক কলিগ আছে না। তোর সঙ্গে একবার পরিচয় করায়ে দিছিলাম। সেই সুপর্ণা, চিনলি। শোন সুপর্ণার বিয়া সামনে। তোর উচিত বিয়ার আগে সুপর্ণারে নিয়া সাভারের সেই গুপ্ত পাহাড় দেইখা আসা।

আমি কোনো কথা বলি না।

জানিস সুপর্ণার বিয়া সামনে। কাকায় কুষ্ঠি দেইখা বিয়ার দিন-তারিখ ঠিক করছে। শ্রাবণ মাসের বাইশ তারিখ বিয়া। আমি ওরে কইছি, আমি বিয়াতে একজন গেস্ট নিয়া যাব। সেই গেস্ট কে বল তো?

চুপ কইরা গেলি যে, সেই গেস্ট কে বল না? যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিস তাইলে তোর জন্য আছে নিশ্চিত পুরস্কার। বল বলে ফেল।

রাখি। বলে আমি ফোনটা কেটে দেই। স্পষ্ট দেখতে পাই, আমাকে খেপানোর পর তিন্নি ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে একটা হাসি দিতেছে।

রওনক জাহানের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতে করতে একদিন দেরি হয়ে গেলে নওরোজ ভাই ফোনে তাড়া দেয়। বলে কি শুভ ভাই। আপনি তো আমাকে বিপদে ফেলে দেবেন। আমার বউ তো বলে, নওরোজ, তোমার বন্ধুদের কাছে আমার কী ইম্প্রেশন তৈরি করছ। শুভ ভাইকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়ে বসে আছি। উনি তো অ্যাকসেপ্ট করে না। নওরোজ ভাইয়ের কথা শুনে আমার মনে হতো রওনক ভাবী দেখতে মোটাসোটা হবে। একটু বোকা বোকা ফানি ক্যারেক্টার। ছেলে বড় হয়ে গেছে, বিদেশে পড়ে। লোনলি ডাবলস। এখন হাজব্যান্ডের ফ্যান্টাসিতে রসদ জোগানোই তার দায়িত্ব। গয়নাগাঁটি, সন্তান-সন্ততির দায়দায়িত্ব নিয়া পেরেশান। সত্যি কথা বলতে, খুব এনজয়িং ক্যারেক্টার হবে ভেবে আমি রওনক ভাবীর প্রোফাইল পর্যন্ত ভিজিট করি নাই। একবার বোধহয় গিয়েছিলাম। কোনো ছবি ছিল না। নওরোজ ভাইকে আর দশটা বাঙালি হিপোক্র্যাট মনে হয়েছিল। যারা অবাধ যৌনবিহারে ব্যস্ত পরনারীদের সঙ্গে কিন্তু নিজের বউয়ের ছবিটা পর্যন্ত দিতে দেয় না তার প্রোফাইলে। কিন্তু রওনক জাহানের রিকোয়েস্ট পেয়ে আমার অবাক হওয়ার পালা শুরু হলো। তাহলে কি আগে আমি ভুল প্রোফাইলে ভুল রওনকের সন্ধান করেছিলাম? রওনক ভাবী একেবারে খাপখোলা তলোয়ার। ক্ষিপ্র চেহারা। মুখে একটা বাঁকা হাসি। ছবি দেখলেই বুক ধক ধক করে। মরে যেতে ইচ্ছা করে। দ্রুত ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করি। নওরোজ ভাইকে ফোন দিয়ে জানাই। নওরোজ ভাই হয়তো রওনক ভাবীকে জানান। দ্রুত অনলাইনে দেখা দেন তিনি।

আপনি কী ভেবেছিলেন? আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন না?

কী যে বলেন ভাবী।

কী বলব। বসিয়ে তো রাখলেন। কেন আমি দেখতে সুন্দর নই।

শুধু সুন্দর বললে কম বলা হয়।

কী বলতে ইচ্ছা হয়? সেক্সি?

ধরে নেন।

ধরব কেন বলেন। বললে সমস্যা কী?

বললাম।

খুব লাজুক তো আপনি।

আমি চুপ থাকলে রওনক প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে। আচ্ছা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো শাং-রি-লা জিনিসটা কী? এইটা কোথায়? নওরোজ শাং-রি-লা যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছে। অক্টোবরের শেষে একটা ট্যুর প্ল্যান করেছি। আমি নওরোজকে বললাম, এইবার আর কোনো মেয়েকে নিয়ে যাবে না। আমাকেই নিয়ে চলো। নওরোজ বলে, শাং-রি-লাতেই যাবে। আপনি তো শাং-রি-লার কথা বলে নওরোজের

মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। এখন বলেন তো শাং-রি-লাটা কোথায়? ডিটেইলটা দেন আমাকে।

রওনকের কথা শুনতে শুনতে আমি ইন্টারনেটে সার্চ দিতে থাকি। জানতাম, শাং-রি-লা বলতে কোথাও কিছু নেই। তবু। আরও নিশ্চিত হতে সার্চ দিতে থাকি। কল্পনার এক স্থান শাং-রি-লা। চিরশান্তির দেশ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। সার্চ দিতে এক গাদা রেজাল্ট এসে হাজির। শাং-রি-লা– মূলত চেইন হোটেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের বিখ্যাত হোটেল চেইন শাং-রি-লা।

নওরোজের এক পার্টনার বলল, এইটা নাকি তিব্বতে। কিন্তু কেমনে যাবে বলতে পারল না। লাসায় গেছেন উনি। একবার বললেন, নেপালে নাকি। নেপালে কী মানস সরোবর? নাকি ভুটানে? আপনি কি জানেন মানস সরোবরই শাং-রি-লা। শুভ ভাই, ডু মি এ ফেভার। জাস্ট টেল মি হোয়ার ইজ ইট? চীন-নেপাল-ভুটান-আসাম এই বেল্টেই শাং-রি-লা। চিরশান্তির দেশ। সেখানে নাকি একটা লেক আছে। যে লেকের চারধারে সব গাছপালা চিরযৌবন পেয়ে গেছে। কোনো মানুষ যদি একবার সে লেকের পানি খেতে পারে তাহলে তার যৌবন চিরস্থায়ী হবে। নওরোজের খুব ইচ্ছা। চিরযৌবন। নওরোজের কাছে শুনতে শুনতে আমারও খুব ইচ্ছা জানেন।

আপনি তো চিরযৌবনা। ছবি যা দেখছি, এখন যদি চেহারা তেমন থাকে তবে আর শাং-রি-লা খুঁজতে হবে না। জাস্ট ধরে রাখলেই হবে।

আচ্ছা? নওরোজ তো আমাকে বোকা বানিয়েছে। বলল খুব ভদ্র ছেলে। কিছু বোঝে না। এখন তো দেখি মুখে কিছু আটকায় না। আচ্ছা দাঁড়ান আপনার নামে নালিশ করতে হবে।

সরি।

সরি কেন রে বাপ। শোনো, এসব সরি ফরি চলবে না। তুমি আমাকে শাং-রি-লার ঠিকানা বলে দেবে আজ বিকেলের মধ্যে। ভাবো, তোমাকে পছন্দ করে এমন একজন নারী চিরযৌবন লাভ করতে যাচ্ছে। একবার কল্পনা করে দেখো।

এই পর্যন্ত আসার পর আমি একটু থমকে গেলাম। বলতে চেয়েছিলাম, শাং-রি-লা একটা রূপকথার দেশ। হয়তো পৃথিবীর কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। মানুষের কল্পনায় আছে এমন এক চিরশান্তির দেশ। মুনি-ঋষিদের মানস সরোবরের মতো। খোয়াজ খিজিরের সেই জলাধারের মতো। বলতে গিয়ে থেমে গেলাম।

রওনকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে তার অ্যালবাম ঘুরে বেড়াই। অসাধারণ, সেক্সি। রিভিলিং সব ছবি। এমন এক বউ থাকতে নওরোজ কেন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় আমি বুঝতে পারি না।

ভাবী, আমার এক বন্ধু চীনে থাকে। ও একবার আমাকে বলেছিল। চীনের কোথায় নাকি এমন এক শাং-রি-লা আছে। এক বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত জানে। সে একবার বলেছিল আমাকে ঠিকানাটা এনে দেবে। কিন্তু আমি ঠিকানা নিয়ে কী করব ভেবে আর পাইনি। আমার তো সামর্থ্য নেই চীন যাওয়ার। দেখি বন্ধুটাকে মেইল করে, ও যদি খোঁজ দিতে পারে তবে ভাবী আপনাদের অবশ্যই জানাব।

যদি জানাও তবে তোমার জন্য স্পেশাল ডিশ রান্না করে খাওয়াব।

ওকে বস।

ওইদিন থেকে রওনক ও তার হাজব্যান্ড নওরোজ আমার মাথা খাইতেছে।

সত্যি সত্যি আমি শাং-রি-লার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি। শাং-রি-লা কোথায়?

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তি বলে, শাং-রি-লা খোঁজেন কেন?

আর বলবেন না। এক বন্ধুর বউ পাগল করে দিছে। সামনে একটা ছুটি। ছুটিতে শাং-রি-লা যাবে। আমি বলেছিলাম ওদের শাং-রি-লার কথা। এখন তো হোটেল চেইন ছাড়া কোনো শাং-রি-লার দেখা পাই না।

সুপ্তি হাসে। চ্যাট বক্সে হা হা হা, হো হো হো লেখে।

আমি বলি, হাসেন কেন?

হাসব না? আপনি এভাবে মানুষকে শাং-রি-লার গল্প বলে এখন তাদের শাং-রি-লার খবর দিতে পারছেন না। কিন্তু জানেন তো, আমি আপনাকে শাং-রি-লার খবর দিতে পারি। সেটা আপনার বন্ধুদের কাজে লাগবে।

নেপালে যেতে বলেন আপনার বন্ধুদের। ওখানে গিয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশতে হবে। খুব সেক্রেড একটা ট্যুরের ব্যবস্থা আছে সেখানে। স্থানীয় লোকজন চালায় সেগুলো। আমার এক বন্ধু একবার গিয়ে এই ট্যুর করে এসেছিল। এই ট্যুরের বর্ণনা আপনি কোথাও পাবেন না। কাঠমান্ডুর বাইরে যেতে হবে। জায়গাটার নাম আমি আপনাকে বলে দেব। সেখানে গিয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে। অপেক্ষা করতে হবে। ওরা ১০-১৫ জনের একটা দল গড়ে তুলতে পারলেই রওনা দেয়। অনেকটা স্পিরিচুয়াল ট্রেকিং। শাং-রি-লার সন্ধানে বের হয়ে পড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটা দল। যে রাস্তায় কেউ কোনো দিন যায়নি, সেই রাস্তা ধরে এগোতে থাকে তারা। ওরা বিশ্বাস করে, একদিন শাং-রি-লার খোঁজ পাবে। এ রকম একটা ট্রেকিংয়ে যেতে বলেন আপনার বন্ধুদের। শাং-রি-লা পাক না পাক, একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে পারবে। আর শাং-রি-লা পেলে তো ভালোই হয়।

সুপ্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি নওরোজ ভাইকে ফোন দেই। ডিটেইল শুনে নওরোজ আত্মহারা হয়ে যায়। বলে ভাই, দ্রুত ঠিকানাটা নেন। আমরা ট্যুর প্ল্যান করে ফেলব। আমার কল কেটে রওনককে ফোন করে। রওনকের ফোন কেটে আবার আমাকে কল করে।

সুপ্তিকে আমি বলি, উনি যেন ভিক্ষুদের দলের খবর আমাকে ডিটেইল জানান। সুপ্তি বলে, ওকে। এখন বলেন, বন্ধুর বউকে নিয়ে ব্যস্ত? নাকি নিজের কথাও কিছু ভাবছেন?

ভাবছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে তিন্নির পরিচয় থাকলে বুঝতেন। সত্যি কথা বলতে, ওর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলাপ আসলেই সম্ভব না।

চেষ্টা করেন। তবু চেষ্টা করেন।

বৃষ্টি নামল আর আমিও এ আশ্চর্য সত্যকে আবিস্কার করলুম

সকালে কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে আমি ভিজছি। কোনো বাস নেই শহরের রাস্তায়। শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বাসের অপেক্ষায়। অফিসে পৌছানোর সময় চলে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। বসকে ফোন দিয়ে জানিয়েছি। আড়াই ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। কোনো সিএনজি, ট্যাক্সিক্যাব পাচ্ছি না। বস বলল, ধীরে ধীরে আসো। সমস্যা নেই। উনিও গুলশানের রাস্তায় আটকা পড়েছেন। গাড়ি আগাচ্ছে না। রাস্তায় পানি জমে অচল হয়ে গেছে শহর। একটা ছাতা আছে হাতে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। থেকে থেকে চতুর্দিক থেকে বাতাস ঝাপটা দিচ্ছে। একেবারে ভিজে গিয়েছি। একটা ভরা বাস এলেও লোকে দৌড়ে উঠে পড়ছে। কোনো রকমে দরজার হাতল ধরে মানুষকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোনো তাড়া নেই। আমি শুধু ভাবছি সুপর্ণার কথা। আমার থেকে থেকে শুধু কান্না পাচ্ছে। কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড নিম্নচাপ শুরু হয়েছে পরশু থেকে। দক্ষিণাঞ্চলে বজ্র, বৃষ্টি আর ঘূর্ণি বাতাস চলছে। একটা বড় ঘূর্ণি ঝড় বঙ্গোপসাগরে ঘুরছে। আমি দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখলাম আমার ফোন বাজছে। ঘরের লাইট জ্বালানো। কোনো লাইট নিভাইনি। মনে পড়ছে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। টিভি-লাইট কিছু বন্ধ না করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। টিভিতে ওজন কমানোর বিজ্ঞাপন চলছে। এশিয়ান স্কাই শপের। রাত ক'টা বুঝতে পারছি না। ফোন দেখে চমকে উঠলাম। সুপর্ণা। ফোন ধরলাম। হ্যালো সুপর্ণা। ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটা। সুপর্ণা কোনো কথা বলছে না। ফোঁস করে আওয়াজ হচ্ছে ফোনের ওপার থেকে। কাঁদছে সুপর্ণা। কেন কাঁদছে? ভাবলাম, আমার স্বপ্নের মাঝে সুপর্ণা কাঁদছে। হয়তো আমি এখনও ঘুমাচ্ছি। স্বপ্নেই ফোন করেছে সুপর্ণা। কাঁদছে। আমি বললাম, সুপর্ণা বলো। তুমি কাঁদছো কেন? সুপর্ণা কোনো কথা বলে না। আমি বললাম, সুপর্ণা কিছু তো বলো। বাসায় কিছু হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন? কাকা ঠিক আছেন তো? সুপর্ণা শুধু হু বলে। তারপর আবার হু হু করে কাঁদতে থাকে। আমি নিজে থেকেই বলি, আমি তো তোমার সঙ্গে দেখা করতেই চেয়েছিলাম। তুমিই তো না বললে। শোনো, কাল দেখা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আমরা...। বলতে বলতেই আমার মনে পড়ল। আজ শ্রাবণ মাসের ২২ তারিখ। আজই সুপর্ণার বিয়ে। আজ মানে রাত পার হলেই। বললাম, সুপর্ণা, আই অ্যাম সরি। আমি বুঝতে পারিনি। আমার মনে ছিল না। আজই তো তোমার বিয়ে। তাই না? তুমি কোথায় বলো তো? বাসায় লোকজন নেই? আমি কল্পনা করি, সুপর্ণা মানুষ ভরা বাসায়

নিজের ঘরে একা বসে কাঁদছে। লোকজনের জন্য আমাকে ফোন করতে পারেনি। ফোন করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেছে। ওহ সুপর্ণা, তোমার কাল বিয়ে। তুমি কাঁদছো কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু বিয়ে তো করতে পারতাম না। তুমি সুখী হবে। খুব সুখী হবে তুমি। শোনো কেঁদো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর শোনো তোমার খুব ভালো বন্ধু হবো আমি। তুমি দেখো। শোনো একটু ঘুমাও। কাল অনেক ভোরে উঠতে হবে তোমাকে। সুপর্ণা কোনো কথাই বলে না। শুধু কাঁদে। আমি নিজ থেকে অনেক কথা বলে যাই। অসহায়ের মতো সুপর্ণার কান্না শুনতে থাকি। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর সুপর্ণার ফোন বন্ধ হয়ে যায়।

সারারাত আমার আর ঘুম আসে না। একটা অপরাধবোধ আমাকে খামছে ধরে থাকে। লাইট, টিভি বন্ধ করে আমি শুয়ে থাকি। ঘুম আর আসবে না। এলোও না। সকালে নাশতা করে বেরিয়ে পড়েছি। চোখে ঘুম ঘুম। রাস্তায় বাস নেই। মাথায় বৃষ্টি। ফুটপাথের নিচে পানি জমেছে।

একটা সিএনজি রাজি হলো দুপুরের দিকে। অনেক জলজঙ্গল পেরিয়ে অফিসে পৌছলাম। রিসেপশনে পৌছতেই রিসেপশনের সুন্দরী সোহেলা বলল, ও মাই গড স্যার। আপনি তো পুরো ভিজে গেছেন।

একটু। বলে ভেতরে পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম।

সোহেলা বলে, গেস্ট বসে আছে আপনার কিউবিকলে। এসির নিচে দাঁড়িয়ে ড্রেস শুকিয়ে নিন।

কে গেস্ট?

নাম বলেনি।

এসির নিচের বাতাসে শার্ট শুকাতে শুকাতে ভাবলাম কে? সুপর্ণা? শরীরে একটা আলোড়ন টের পেলাম। পেট মোচড় দিয়ে উঠল। যদি সুপর্ণা বিয়ের আসর থেকে উঠে এসে এখানে বসে থাকে তবে আমি কী করব? ও এতটুকু করতে পারলে ওকে বিয়ে করতে পারব। নিশ্চিত।

হতে পারে, রওনক ভাবী এসেছে অথবা নওরোজ। শাং-রি-লার চিন্তায় বিভোর। শাং-রি-লার টানে সোজা অফিসে এসে পড়েছে। হতে পারে। শার্ট শুকিয়ে, মাথার চুল আঁচড়ে কিউবিকলের দিকে রওনা হলাম। যেতে যেতে তিনজন গেস্টের খবর দিলো। কিউবিকলে উঁকি দিয়ে দেখলাম, আমার সিটে বসে আছে মেয়েটি। ডেস্কের দিকে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত কাঁদছে। তিন্নি।

তিন্নি।

ডাকতেই ফিরে তাকাল। তিন্নি কাঁদছে। ওর হাতে টিস্যু পেপার।

মাই গড। তিন্নি তুমি? ফোন দাওনি কেন? কী ব্যাপার? কোনো দুঃসংবাদ?

তিন্নি কোনো কথা বলে না। আশপাশের কিউবিকলে কয়েকটা উৎসুক কান খাড়া হয়ে আছে। বললাম, আসো।

বসের রুমের পাশ দিয়ে কনফারেন্স রুমে ঢুকলাম। তিন্নিকে বসিয়ে বসের রুমে এলাম।

বস।

টেক ইওর টাইম। ধরে নাও আজ কোনো কাজ নেই। সামলাও।

বস।

ওকে দেখেই আমি বুঝেছি ঘটনা সিরিয়াস। অফিসের বাইরে গেলে যাও।

বসের রুম থেকে কনফারেন্স রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। বললাম, কী ব্যাপার বন্ধু, গরিবের অফিসে তুমি কী করো? তোমার অফিস নেই?

তিন্নি কাঁদতে শুরু করে। শব্দহীন হু হু করা কান্না।

আকাশ কাঁদছে, সুপর্ণা কাঁদছে, তিন্নি কাঁদছে। না জানি দুনিয়ায় কে কে কাঁদছে আরো।

আজ কান্না দিবস। আজ বৃষ্টি।

আমি তিন্নির পাশের সিটে বসে ওর হাতটা ধরি।

তিন্নি আমার বুকে হেলান দিয়ে কাঁদে।

একবার তিন্নির খুব জ্বর হয়েছিল ফার্স্ট ইয়ারে। জ্বরে একেবারে কাবু হয়ে গিয়েছিল। বলল, হলের রুমে থাকতে আর ভালো লাগছে না। আমি ওর হলে গিয়ে ওকে নিয়ে গাছতলায় সারাদিন বসে ছিলাম। পানি খাইয়েছিলাম। ব্রেড খাইয়েছিলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে সারাদিন বসে ছিল। জ্বর হলে মানুষের শরীর কেমন নরম হয়ে যায়। তিন্নির দেহের জ্বর আমাকে স্পর্শ করছিল। কোনো কামভাব নেই। শুধু জ্বর এসে লাগছিল আমার শরীরে। পরম নির্ভরতায় সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছিল। বসে ছিল। আমি ওর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে বলছিল, বন্ধু তুমি এত কেয়ারিং কেন?

আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ এর আগে কেউ আমাকে এভাবে কেয়ারিং বলে কমপ্লিমেন্ট দেয়নি। মনে হচ্ছিল, তিন্নি আমাকে বুঝতে পারছে।

আজ আবার অনেকদিন পর তিন্নি আমার শরীরে নির্ভরতার হেলান দিয়ে বসেছে। আজও ওর শরীরের নরম আমি অনুভব করতে পারছি। তবে আজ জ্বর নেই। কোনো জ্বর আমি অনুভব করছি না। আমি তিন্নির চুলে বিলি কেটে দিতে থাকলাম।

তিন্নি কিছুক্ষণ কাঁদার পর কথা শুরু করল। ভারী কাঁপা কণ্ঠে বলল, তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার।

বলো।

কীভাবে যে বলি, কীভাবে বলব তোমাকে।

বলো।

তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবা না।

বলো না। শুনি আগে।

আজ সুপর্ণার বিয়ে।

হু। জানি তো। তুমি আমাকে নিয়া যাবা বলছিলা।

বিয়েতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছো? শোনো তিন্নি, সুপর্ণার সঙ্গে যা হইছে সেইটারে আমি ভাগ্যের লিখন মনে কইরা নিছি। তুমি কোনো কষ্ট নিবা না। তুমি যদি

কষ্ট নিয়া এমনে কান্নাকাটি করো তাইলে কেমনে হবে। তুমি তো অনেক শক্ত মেয়ে, তাই না? তুমি এমন করো কেন? কোনো গিফট কিনছো? চলো দুইজনে মিলে গিফট কিনে সুপর্ণাকে গ্রিট করে আসি।

তোমার কোনো ধারণাই নাই শুভ। আমি কেন কাঁদছি। শুভ তুমি জানো না কিছু।

বলো তাহলে।

তিন্নি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বলে, তবু তোমাকে বলতেই হবে।

সুপর্ণার বিয়ে হচ্ছে বলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব।

তার মানে তুমি কি চাও সুপর্ণার সঙ্গে আমার কিছু হোক?

না শুভ। তুমি আমার কথা শোনো। শোনো শুভ। আই লাভড সুপর্ণা।

তুমি ওকে পছন্দ করো, এটা তো আমি জানি।

তুমি জানো না। তুমি যেমন পছন্দ করো, তেমন। আই ওয়াজ ইন ডিপ লাভ উইথ সুপর্ণা। আই লাভড হার অ্যাজ আ পার্টনার।

ও মাই গড! আমার বসার চেয়ারটা থেকে যেন আমি পড়ে যাচ্ছি। তিন্নি আমার গায়ে হেলান দিয়ে আছে। কিন্তু আমি আর তার অস্তিত্ব অনুভব করছি না। মনে হচ্ছে, তিন্নি এখানে নেই। কে আমার পাশে বসে আছে? আমি ঘেমে যাচ্ছি।

তার মানে তুমি সুপর্ণার সঙ্গে প্রেম করতে। তোমাদের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। তোমরা লেসবিয়ান। আজ সুপর্ণার বিয়ে বলে তুমি আমার কাছে কাঁদতে এসেছো। মাই গড। তিন্নি আমি এটা কী শুনলাম। সুপর্ণা, তিন্নিকে নিয়ে আমার সব স্মৃতি মুহূর্তে সার্কারামার মতো আমার চারদিকে ঘুরতে থাকল। আমি একে একে জোড়া দিতে থাকলাম সমস্ত ঘটনা। এক এক করে। আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে। মিলছে একে একে।

তিন্নি বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবা না। ক্ষমা করা সম্ভব না। কিন্তু শুভ তুমি জানো না, আমি ওকে কত ভালোবাসি। আমি ওকে বলেছিলাম, আমাকে বিয়ে করো। ও রাজি ছিল। কিন্তু তোমার প্রেমে পড়ার পর ও ঘুরে গেছে। একটা ছেলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ও। শুভ আমি জানি আজ তোমার মনের অবস্থা কী? আমার কথাও একবার ভাব। তুমি যদি ওকে এত ভালোবাসতে পার তবে আমি পারব না কেন? বলো? তুমি কি এইটাকে ভুল মনে করো? এইটাকে ঘৃণা করো? তোমার মতটা আমার জানা দরকার।

শুভ তুমি যেদিন প্রথম ওকে চুমো দিয়েছিলে সেদিনকার ঘটনা আমাকে বলেছিল ও। আমি খুব জেলাস হয়েছিলাম। আমি তোমাকে ফোন করে বলতে চেয়েছিলাম, তুমি আমার রাস্তা থেকে সরে যাও। নানা কথা ভেবে আর বলতে পারিনি। তুমি তো আমাকেও ভালোবাসো, তাই না? কীভাবে তোমাকে বলতাম বলো। কিন্তু আজ আর মাথা ঠিক নেই। অফিসে গিয়ে আর বসতে পারছিলাম না। ভাবলাম তোমার কাছে যাই। তুমি ছাড়া তো আর কেউ নেই। তোমার কাছে এলাম। তুমি হয়তো আমাকে বোঝার চেষ্টা করবে, অ্যাটলিস্ট।

ঠিক। আমি এখন তিন্নিকে বোঝার চেষ্টা করছি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তিন্নির রহস্যময়তাকে অনুধাবন করতে পারছি। রহস্য খোলার রেঞ্চ যেন সহসা আমার হাতে এসে পড়েছে। তিন্নি কেঁদেই চলেছে। না কান্নার মধ্যে কোনো কপটতা নেই। হয়তো কোনো এক নীরব মুহূর্তে তিন্নি আর সুপর্ণা পরস্পরের আনন্দ ভাগবাটোয়ারা করতে শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে প্রচণ্ড ভালোবেসেছিল। তারপর হঠাৎ আমি তাদের অস্তিত্বের মধ্যে আরেক অস্তিত্ব হয়ে হাজির হলাম। তিন্নি জ্বলে পুড়ত, আমি ভাবতাম আমার প্রেমে। যদি জানতাম, সে সুপর্ণার প্রেমেই জ্বলছে, তবে কীইবা করতে পারতাম?

তিন্নি এখনও আমার শরীরে হেলান দিয়ে আছে। ওর শরীরের অস্তিত্ব আমি অনুভব করতে পারছি। ওর স্তনের নরম আমাকে স্পর্শ করে রেখেছে। ওকে একটু সরিয়ে দিতে চাইলাম। একটু উঠতে চাইলাম। আমি দাঁড়াতেই তিন্নি আমাকে আবার জড়িয়ে ধরল দাঁড়িয়ে। বলল, তুই ছাড়া আমার কেউ নাইরে।

বললাম, তিন্নি অনেক সময় তো হলো। এবার চল, বাইরে বের হই। বস ছুটি দিয়েছে। চল, কোথাও খেয়ে তোকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

দোস্ত তুই কি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিস?

কী বলিস। ঘৃণা করব কেন? বরং তোর প্রতি আমার কাম জাগতেছে। এখানে কনফারেন্স রুমে একসঙ্গে থাকাটা রিস্কি। চল, বেরিয়ে পড়ি।

কোথাও গিয়ে দুই বন্ধু প্রেমিকা হারানোর কথা শেয়ার করতে করতে গলা ধরে কান্দি।

আমার খুব ইচ্ছা করছে সুপর্ণার সঙ্গে কথা বলতে। সুপর্ণা আমাকে সব বলেছে। তবু কেন যে, কোনো প্রতিজ্ঞার কারণে তিন্নির কথা বলতে চায়নি জানি না। বুঝতে পারি না। সুপর্ণাকে কিছু বলা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারি না। সুপর্ণা নতুন করে সংসার শুরু করেছে। খুব গুছিয়ে নিয়েছে। সামলে নিয়েছে। অফিসে আসে। কিন্তু তিন্নির সঙ্গে কথা বলে না। তিন্নি আমাকে জানায়, নিয়মিত। আজ সুপর্ণা কোন শাড়ি পরে এসেছিল। তিন্নি সারাক্ষণ সুপর্ণা সুপর্ণা করতে থাকে। আমি বলি, দোস্ত আগে ভাবতাম ছেলেরাই মেয়েদের প্রেমে পড়ে পাগল হতে পারে। এখন দেখতেছি তুই ছেলেদের প্রেম কাহিনীকে হার মানাচ্ছিস। তিন্নি হাসে, বলে বন্ধু, এইভাবে বইল না। আমি তো শুধু নিজে পাগল হইছি। তুমি তো সুপর্ণারেও পাগল কইরা দিছিলা।

ফোনে তিন্নির সঙ্গে রেগুলার কথা হইতে থাকে। তিন্নির নির্ভরতা বাড়তে থাকে হয়তো। হয়তো সাময়িক অবসাদ কাটাতে সে আমার সঙ্গে শেয়ার করতে থাকে। গল্পের এই ডেভেলপমেন্ট আমি আর কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারি না। নিজে নিজে বিশ্লেষণ করতে থাকি। তিন্নির ঘটনাটা আমি কীভাবে নিয়েছি, আমার মনে ঘটনাটার কী ছাপ পড়েছে বোঝার চেষ্টা করি। বুঝতে পারি না। আমি ঘটনাটাকে কীভাবে নিয়েছি, সেটা তিন্নিও বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারি না।

কিন্তু ভেতর থেকে একটা যৌনতাবোধ আমাকে তাড়া করে। গভীর রাতে আমি তিন্নিকে এসএমএস করি। তোমাকে চুমো খেতে চাই। আই ওয়ান্ট ইউ। তিন্নি ফোন

করে, কীরে সমস্যা কী তোর? তোর কি ধারণা আমি সুপর্ণাকে খাইছি বলে তোরেও খাব? এত রাতে কী হইছে তোর। এসএমএস করার মতো সিরিয়াস কী ঘটছে? শোন তোকে একটা কথা বলি, আমার নিজ থেকে যদি কখনো তোর প্রতি এ রকম কোনো অনুভূতি হয়, তাহলে তোকে বলতে হবে না। তোকে আমি নিজে থেকেই প্রোপোজ করব। বন্ধু, তুই আমাকে প্রেশার করিস না। তুই তো আমাকে বুঝিস।

না আমি তোকে বুঝি না। আমরা কতদিনের বন্ধু। তোকে তবু আমি বুঝতে পারি না। মনে হয় তোর প্রতি আমার কোনো অধিকার নেই। শুধু কথার বন্ধু হয়ে আছি, মনে হয়। আমি একটা কথা বলি তিন্নি। ইন ফ্যাক্ট, আমি ডিসিশন নিয়ে ফেলছি, তোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমি রাখব না। আনলেস ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং মোর। ধরে নেও আজকেই তোমার সঙ্গে আমার লাস্ট কথা।

তিন্নি চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ওকে। দেখা যাক। কতদিন পারিস।

নাজিয়া অনেকদিন পরপর দেখা দিচ্ছে। রাতে ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে। দিনে কাজ করছে। নাজিয়ার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি মানুষের জীবনে ক্লান্তির কি বিশাল ভূমিকা। দিনের কাজ শেষে ক্লান্তি, ক্লান্তি দূর করার অনেক চেষ্টার পরও যখন ঘুম নেমে আসে তখন আর কিছু মনে পড়ে না। নাজিয়া আর নাফিসের কথা কিছু মনে পড়ছে না। এত ব্যস্ত সে। অনেক ব্যস্ত। নাজিয়া এখন যেটুকু সময় পায় শেরির সঙ্গে কাটায়। কখনো আমার সঙ্গে ঘুম আর অফিসের ফাঁকে কথা হয়। খবর জানায়। মাঝে মাঝে ফোনে কল দেয়। ওর আনন্দের কথা শোনায়। মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয়, ওর নাজুক সময়টাকে ওকে কত সময় দিয়েছি সে কথা। বলে, দেশে আসবে ২০১৪ সালে। আমি বলি, অত দিন কি বাঁচব। বলে তোমরা একদম প্ল্যান করে চলো না বাংলাদেশে। এখানে কিন্তু সবাই পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে চলে। জানো তো। আমিও এদের কাছে এসব শিখছি। ক'বছর চাকরি করব, কত টাকা জমাব। দেশে গিয়ে কী করব। নাজিয়া প্রাকটিক্যাল মেয়ে। বলি, তোমার সাবজেক্ট নিয়ে কিছু ভাবো। মেডিকেল অ্যানথ্রোপলজি কিন্তু আমাদের দেশে এখনও নতুন সাবজেক্ট। দেশে কিছু গবেষণা করো। কাজে লাগবে।

নাজিয়া বলে, করব। তার আগে অনেক কাজ আছে। এখানে আমাকে অনেক ওপরে উঠতে হবে। দেশে তো জেনে গেছে, আমাদের ডিভোর্সের কথা। বাবা কী বলেছে জানো, বলেছে, নিশ্চয়ই তুমি সবদিক ভেবেই ডিসিশন নিয়েছ। এখন আমি চাই, তুমি আগে যেভাবে বলতে সেভাবেই চলবে। তোমার একটা গোল থাকবে। তুমি আর সবার মতো যেনতেন একটা ক্যারিয়ার গড়বে না। তুমি এমন একজন হবে যাকে দেখলে নাফিসের মতো ছেলেরা হিংসা করে। যাতে তাদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগে।

আমার একটা ছোট বোন আছে জানো তো। ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরব না।

নাজিয়াকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে ভাবি। কেউ দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ-ক্লান্তি থেকে পালানোর জন্য স্মৃতির মধ্যে ঢুকে যায়। আর কেউ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচতে দৈনন্দিনতার মধ্যে ঢুকে যায়। সাবিনা মেহনাজ সুপ্তি আমার কথা শুনলে নিশ্চয়ই খুব

খুশি হতেন। বলতেন, স্মৃতি দৈনন্দিনতা সব পথই এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে। মুক্তি। কিন্তু মুক্তি আসলে লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হওয়া উচিত মোক্ষ। আর জানেন তো, নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। কারো দেখানো পথে অন্য কারো মোক্ষ ঘটে না।

নাজিয়া তাড়াহুড়ো করে অফিসের উদ্দেশে বের হয়ে গেলে আমি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। নওরোজ ভাই ফোন দেয়। বলে, আপনাকে অনলাইনে দেখতে দেখতেই বেরিয়ে পড়লেন। জরুরি কথা ছিল। শুভ ভাই, কাঠমান্ডুর ভিক্ষুদের ঠিকানা কি বের করতে পেরেছেন নাকি? সামনে শীত কিন্তু মিস দিতে চাই না। রওনককে নিয়ে অনেকদিন ট্যুর দেয়া হয় না। নেপালে গেছি অনেকবার। রওনক যায়নি। যদি শাং-রি-লার খবর মেলে তো বারবার যেতেও আপত্তি নেই। অমরত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আপনি তো জানেন আমি খুব প্রাকটিক্যাল। কিন্তু, রওনকের খুব বিশ্বাস। ও তো সারাদিন ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে এসব খোঁজে। নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, চীন সব দেশ সে ইতিমধ্যে ঘুরে ফেলেছে। থ্যাংকস শুভ ভাই। রওনককে আপনি একটা মজার জিনিস ধরিয়ে দিয়েছেন। ও যখন আমাকে প্রতিদিনের অভিযানের গল্প বলে তখন এত ভালো লাগে।

আমি আর কী করলাম।

শুভ ভাই, আপনি এত বিনয়ী কেন বলেন তো। আর আপনার বিচার আছে। আপনি এখনও একদিন আমাদের বাসায় এলেন না। রওনক কী বলে জানেন? বলে শুভ ভাইয়া আমাদের সঙ্গে আসলে ফেসবুকের বাইরে সম্পর্ক রাখতে চায় না। ফেসবুকের বাইরে আত্মীয়তা করতে চায় না। আপনি সত্যি করে বলেন তো। কথাটা কি ঠিক?

অভিযোগটা হয়তো সত্যি। ফেসবুকে বসে একজন অচেনা নওরোজকে যতটা প্রাণ খুলে নিজের কথা বলা যায়। পরিবারের পরিচয় জেনে, একটা জাঁদরেল ব্যবসায়ীর সঙ্গে ততটা খোলামেলা হওয়া যায় না। পুরনো বন্ধু মনে হয়। আর এমন আপন হয়ে যায় লোকটা।

আমি এই পৃথিবীকে রক্তমাংসের ধ্রুব বাসনা জেনেছি

রওনক নিজেও শাং-রি-লা হোটেলের খবর জেনে গেছে এতদিনে। চ্যাট করতে করতে আমাকে লিঙ্ক পাঠায়। বলে, জানো তো, ইভেন মালদ্বীপেও এরা বড় একটা ফাইভ স্টার ওপেন করেছে।

সত্যি?

সত্যি না তো কী? দেখো, মনে হবে স্বপ্নের মতো। আচ্ছা এসব হোটেল দেখলে তোমার কী মনে হয়?

ভাবী, আপনারা ওয়েল অফ। এসব হোটেলে থেকেছেন। আমি কখনো থাকিনি। আমি বলতে পারব না, কেমন অনুভূতি হয় এই হোটেলগুলো দেখলে। তবে আমি একটা ধারণা করতে পারি।

বলো না। সেটাই শুনি। তোমার অবজারভেশন আমার ভালো লাগে। ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট।

খাপখোলা তলোয়ার যখন ব্রিলিয়ান্ট বলে তখন নিজেকে মস্ত যোদ্ধা মনে হওয়ার কথা। খুব ভালো লাগে। এর সঙ্গে আগে কেন কথা বলিনি। ভাবি। মনে মনে বলি, নওরোজ ভাই এত কথা বলে। একদিনও তার বউয়ের সৌন্দর্যের প্রশংসা করল না।

ভাবী। একটা সিনেমা দেখছিলাম। সেই সিনেমায় দুইটা চরিত্র বিলাসবহুল হোটেল রুমের আলোচনা করে একটা হোটেল রুমে বসে। কী বলে জানেন? ছেলেটা জিগায়, কেমন মনে হইতেছে? মেয়েটা বলে, এই হোটেল রুমগুলো আমাকে সবসময় একটা অপরাধবোধের মধ্যে ফেলে দেয়।

খুব সেক্সিস্ট উক্তি না? আচ্ছা বলো তো, হোটেল রুম কি শুধু যৌন অপরাধের জন্য?

তা না। কিন্তু একেকজনের একেকরকম মনে হইতে পারে না? আমার কাছে এসব হোটেল, এই যে ছবির মতো সাজানো হোটেল। যেখানে দু'তিনদিনের বেশি কোনো মানুষ থাকে না। সেইগুলাকে সাদ্দাদের বেহেশত মনে হয়। পৃথিবীর নশ্বরতা, ক্ষণস্থায়িত্বের কথা মনে করায়ে দেয়। এইগুলা।

ভেরি স্পিরিচুয়াল।

শোনো, তোমার হোটেল পছন্দ না বুঝলাম। কিন্তু বাসা কি ভালো লাগে?

মানে কী?

মানে ধরো ঘর কেমন?

ঘর হলো একটা রুম। মানুষ নিজের মতো একটা জায়গাকে প্রতিদিনের জন্য সাজিয়ে তুললেই সেটা ঘর।

মাই গড। তুমি তো সত্যি একটা বোকা দেখছি। শুভ ডিয়ার, আমি কি তোমাকে ঘরের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করেছি বলো?

হু।

হু কী? বোঝো না?

বুঝি তো। আপনাকে দেখলেই তো কেমন কেমন করে।

দেখলে মানে কী? দেখেছো আমাকে? কোথায় দেখলে?

কেন ফেসবুকে প্রতিদিন দেখি আপনার প্রোফাইল।

তাতে হয়? সামনাসামনি দেখতে ইচ্ছা করে না?

আসো না কেন, একদিন নওরোজের সঙ্গে আসো। দেখে যাও।

রওনকের কথায় অভিভূত হয়ে যাই।

কারো বাসায় যেতে ইচ্ছা করে না। অনেকদিন একা একা থাকি তো। ফ্যামিলি ভালো লাগে না। ফ্যামিলি বুঝতে পারি না আমি। তবু যাব একদিন আপনাকে দেখতে।

ওকে আসতে হবে না। তোমার বাসার ঠিকানা দাও আমিই যাব।

আরেব্বাস। আপনি আসবেন?

কেন ভয় লাগে?

একটু। ঘরের বাইরে একদিন দেখা দিলে হয় না?

দেবো।

প্ল্যান করো। একটা বাইরে কোথাও যাই।

আপনি কি জানেন সাভারের পাশে একটা পাহাড় আছে। জঙ্গল ঘেরা সেই পাহাড়ের ভেতর একটা সরোবর আছে। চারদিকে বাঁশঝাড় ঘেরা সেই সরোবরের চারদিকে হাজার হাজার বকপাখি উড়ে বেড়ায়।

তুমি গেছ?

আমি যাই নাই। তবে নোমান ভাই গেছে। নোমান ভাই বলছে। নোমান ভাই এক মজার লোক। আমি বলব নে আপনাকে অ্যাড করতে।

নোমানের কথা রাখো। তুমি আমাকে নিয়ে ওখানে যেতে চাও কি-না বলো।

আপনি যাবেন?

হু। যাওয়ার জন্যই তো তড়পাচ্ছি। নিয়ে যাবা?

যাবো।

কবে যাবা? সামনে নওরোজ চিটাগাং যাবে। নেক্সট ফ্রাইডে। তোমার ডে অফ থাকবে। চলো, ওইদিন যাব। গাড়ি নেব?

না না না গাড়ি না।

ওকে ডিয়ার। নো গাড়ি। ভোরবেলা লোকাল বাসে করে যাব। একটা ভাঙা হোটেলে পরাটা খাব ডিম ভাজা দিয়ে। চা খাব। পথে যা পাই তাই খাব। একটা ব্যাপার বলো, নওরোজকে বলবে?

মাথা খারাপ?

গুড। মাথা কাজ করতে শুরু করেছে তোমার।

সূর্য কেবল উঠেছে। আজ বেশ আলো হবে আকাশে। নভেম্বরের শীতের সূর্য। মিষ্টি মিষ্টি রোদ। রওনক আর আমি হাঁটছি। রওনকের ক্ষিপ্র দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটছি। রওনক মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে আমাকে। কী দেখো? দেখি, রোদ উঠলে তোমাকে কেমন দেখায়। আর কী দেখো। দেখি, তুমি কেমন করে হাঁটো। আর কী দেখো? দেখি তোমার তামাটে বর্ণ রোদে কেমন লালটে দেখায়। তার মানে তুমি কিচ্ছু দেখো না।

ভোরে রওনক ফোন করে ঘুম ভাঙিয়ে এসে মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছয়টায়। সাভার পৌঁছতে পৌঁছতে সাতটা। মোড়ের হোটেলে ঠিকই ডিম-পরোটা দিয়ে নাশতা সেরেছি দু'জনে। চা খেয়ে রিকশা করে ভাঙা রাস্তায় গাদাগাদি করে বসে রাজাশন নেমেছি। কাঁচা রাস্তায় কমলাপুরের দিকে হেঁটেছি অনেকক্ষণ। রওনক শুধু বলে, আমি দেখতে কেমন?

সুন্দর।

শুধু সুন্দর?

অনেক সুন্দর।

শুধু অনেক সুন্দর?

আমি হাসি। রওনক বলে হেসো না তো।

রাতে রওনক জিজ্ঞেস করেছিল শাড়ি পরবে কি-না। আমি বলেছি না। শাড়ি পরলে অনেক পথ হাঁটতে পারবেন না। রওনক একটা শাদা ড্রেস পরেছে। কপালে টিপ দিয়েছে। লম্বা চুল পেছনে খোঁপা করে বেঁধেছে। খোঁপায় বড় একটা কাঠি গুঁজে দিয়েছে।

কাঁচা রাস্তাও শেষ এখন।

একটা কাঁচা সবুজ গন্ধ এসে নাকে লাগছে। বলো তো কী রওনককে জিজ্ঞেস করি আমি।

ওই দেখো। দূরে হলুদ শর্ষে ক্ষেত। এখনও পুরো ফুল আসেনি। সবুজ হলুদের মিশ্রণ।

ওয়াও। রওনক হেসে ওঠে।

পথ থেকে ক্ষেতে নেমে যাই। দূরে গ্রাম। শর্ষে ক্ষেত্রে ঘ্রাণ নাকে নেয়ার জন্য ক্ষেতের দিকে যাই। রওনক দুই হাত দুই দিকে ছেড়ে দিয়ে বাতাসে শ্বাস নেয়।

অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে থাকে। জানো, আমি কখনো এভাবে ক্ষেতের মধ্যে এসে দাঁড়াইনি।

ক্ষেতের ধারে শর্ষের ঝাঁঝালো গন্ধ নেয়ার পর দূরের গ্রাম লক্ষ্য করে আবার হাঁটতে থাকি।

শাদা মূলার ফুল ফুটে আছে। তারও অন্যরকম ঝাঁঝালো গন্ধ। মটরশুঁটি। ডাঁটা শাক, লাল শাক। করলার ক্ষেতের আল ধরে ধরে একটা গ্রামে পৌঁছাই। কয়েকটা বাড়ি। কয়েকটা তাল গাছ। একটা ছোট দোকান। এগারোটা বেজে গেছে।

রওনক একবারও জিজ্ঞেস করে না, কোথায় তোমার সরোবর।

পথের আনন্দটাও কম না তাই না? নিজের মনে ভাবি আমি। মনে হয় এই খাপ খোলা তলোয়ার আজ আমার।

আমাদের খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।

দোকানে পানি নেই। রওনক বলে, চলো একটা বাড়িতে যাই। দেখে শুনে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। একটা শুকনো কালো মেয়ে আমাদের বেঞ্চিতে বসতে দেয়। বলে, আপনার বকপুকুর দেখতে আইছেন?

রওনক আমার দিকে তাকায়। বলে তার মানে খুব কাছে? ও চেনে দেখি।

চিনুম না? মেয়েটা হেসে বলে। বাইরের কেউ চেনে না। আর এত পথ হাঁইটা আইব কে এতদূর।

মেয়েটা আমাদের পানি খাওয়ায়। ওর স্বামী রিকশা চালাতে সাভার গেছে। বলে, এখনও অনেক পথ। আপনেরা চাইলে আমি যাইতে পারি। দেখায়ে দিতে পারি।

কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার আমরা রওনা হই। মেয়েটা সামনে সামনে চলে। আমি আর রওনক পেছনে। একটা শুকনো সবুজ নদীখাত পার হয়ে জঙ্গল শুরু হয়ে যায়। রওনক আমার হাত ধরে। মেয়েটা বলে, আপা ভয় নাই। এই এলাকায় সবাই পরিচিত।

এবার আমাদের কাছাকাছি থেকে হাঁটে মেয়েটা। রওনককে জিজ্ঞেস করে, উনি আপনার কে হয়?

রওনক হাসে। বলে, উনি আমার বর।

আমার কান গরম হয়ে আসে। কী বলে রওনক। বন্ধু বলতে পারত। ভাই বলতে পারত। কিছু না বলে সোজা বর? আমি কিছু না বলে, একবার রওনকের দিকে তাকিয়ে থেমে যাই। ঠোঁটে একটা বদমাশের হাসি।

ইয়ং ছেলেকে বিয়া করছেন আপা?

হু। কেন, ভালো না?

ভালোই।

মেয়েটা হাসে। নদীখাত পার হয়ে ভূমি এবার উঠে গেছে। উঁচু জায়গাটায় উঠলেই দেখা মেলে বাঁশঝাড়। নিচে অনেক চুপচাপ হলেও উঁচুতে উঠলেই অসংখ্য পাখির কাকলি। দূরে একটা বড় টিলা। ছোট মাটির পাহাড়।

আমি বলি, বক পাখি কই?

আছে। টিলায় ওঠেন দেখবেন।

মেয়েটা বলে টিলায় উঠতে তার মন চায় না। আমরা যেন টিলায় উঠি। উপরে ওঠার কোনো পথ নেই। আমি একটু উঠে রওনককে টেনে নেই। এইভাবে ঘন বাঁশবনের মধ্যে উঠে পড়ে। মেয়েটা আমাদের ওঠা দেখে হাসছে। আর সাহস নিয়ে উপরে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা না ফেরা পর্যন্ত যেন সে ওখানেই থাকে বলে এসেছি। ও থাকবে। কারণ ওর কাজ নেই। আমাদের সঙ্গে দুপুরটা কাটাতে পারলেই খুশি। বাঁশবনের মধ্যে একটু হাঁটতে হলো। তারপর মিলল সেই সরোবর। গোল একটা জলাধার। রওনক ওয়াও বলে উঠল। দূর থেকে মেয়েটাকে দেখলাম। ও আর আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তবু এদিকে তাকিয়ে বসে আছে। স্বচ্ছ পানির ওপর বাঁশপাতা পড়েছে। এখানে এই সরোবর কে বানাল?

রওনক সরোবরের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল।

আমি ওর হাত ধরে ফেললাম। এবার আসো তোমার বিচার করি।

কেন? কী?

আমি তোমার বর?

তুমি আমার বর না? তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

হি হি হি করে হাসে রওনক।

তাহলে আসো।

আমি রওনকের ঠোঁটের দিকে তাকাতেই সে মুখ সরিয়ে নেয়।

খবরদার।

আমি একটু থমকে যাই। হঠাৎ কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে একঝাঁক বক এপারের বাঁশঝাড় থেকে ওপারের বাঁশঝাড়ে চলে যায়। রওনক বলে চলো বসি।

জানো শুভ। আমার অদ্ভুত একটা ফিলিং হচ্ছে। কয়দিন খুব শাং-রি-লা খুঁজলাম জানো তো। এখন কী মনে হচ্ছে জানো? এই পুকুরটা মানস সরোবর। এর পানি খেলে চিরজীবন পাওয়া যাবে। তুমি কি চিরজীবনে বিশবাস করো?

আর এই পুরো এলাকাটাকে মনে হচ্ছে শাং-রি-লা। মেয়েটাকে দেখলে। কেমন দেবদূতের মতো অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আচ্ছা বলো তো চিরযৌবন বলে কিছু আছে?

আছে।

সাবিনা মেহনাজ সুপ্তির কথা বলি আমি। বলি, তোমার চিন্তা, ভাবনা সম্পদ কোনো যুবতী-যুবকের হাতে দিয়ে তুমি সরে যাবে। এটাই চিরযৌবন।

রওনক বলে, তোমার কেমন লাগছে।

আমার মনে হচ্ছে, আমি অমৃতকুম্ভের সন্ধান পেয়েছি। সে অমৃতকুম্ভ কি জানো?

কী?

তোমার ঠোঁট। আমি রওনকের দিকে হেলে পড়ি। রওনক হাসে। সরে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি তোমার বড় না? বড়দের তো কোনো সম্মান করো না। আমি রওনকের পিছু নিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরি। রওনক মুখ ঘোরায়। আমি ওর ঠোঁটে চুমো দিলে। ও চোখ বন্ধ করে। অনেক সময় ধরে চুমো খাই আমরা।

রওনক কাঁপছিল। আমি ওকে ছেড়ে দিলে ও কেঁদে ফেলল।

তুমি এটা কী করলে বলো তো। নওরোজের বাইরে কেউ কোনোদিন আমাকে স্পর্শ করেনি। তুমি এ রকম করলে কেন?

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

চুমো খাওয়ার পর সবাইকে এই ডায়লগ বলো?

সবাই মানে কী?

তোমার ফেসবুকের বন্ধুদের।

কী যে বলো না? আমি কি নওরোজের মতো নাকি।

তুমি কী? তুমি যে কী সে তো আমি আজ বুঝলাম।

তবে শুভ থ্যাংকস। সত্যি তুমি আমাকে প্রেমে পড়াতে পেরেছো। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।

ফেসবুকে বসে বহু ভালোবাসাবাসি হলো/আমার ও মাধবীর

অনেক দিন পর আবার জীবনের দেখা মেলে। স্বাস্থ্য সচেতন গোছানো জীবন। বলে শুভ ভাইয়া, কী বলেছিলাম মনে আছে তো? এতক্ষণ ধরে অনলাইনে থাকেন দেখে আমার খুব চিন্তা হয়। একবার যদি আপনার দেখা পেতাম তো বলতে পারতাম। একবার আসেন না। আমার রুমটা দেখলে আপনার কিছু ধারণা হতো। সবসময় মনিটরের আলো কমিয়ে রাখবেন। খুব কমাবেন না, তাহলে চোখের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। আচ্ছা, আপনি তো আসবেন না। আমি একবার গিয়ে আপনার মনিটর ফিক্সড করে দিয়ে আসব। আর একটা কথা বিছানায় শুয়ে ল্যাপটপ ব্যবহার করবেন না। বেশি সময় কোলে রেখেও ইউজ করবেন না। পিসি যেভাবে ইউজ করেন সেভাবে রাখবেন। জীবন ছেলেটা এত কেয়ারিং কেন আমি ভাবি।

আপনি খুব কেয়ারিং জীবন। এ রকম ছেলেরা ভালো বউ পায়।

আমি তো জানতাম, যাদের নাক ঘামে তারা সুন্দরী বউ পায়। কেয়ারিং হলে কি পায় নাকি?

পায় তো।

আপনি বিয়ে করেছেন?

না।

আপনি?

বিয়ে তেমন কিছু না।

মানে কী?

ফেসবুকের বিয়ে।

সেটা কেমন?

ওই তো। স্টেটাস বদল করা। প্রোফাইলে বিবাহিত লেখা। তেমন কিছু না।

আমি দ্রুত জীবনের প্রোফাইলে গিয়ে হাজির হই।

ম্যারিড টু মাধবী।

জীবন, এমন কিন্তু কথা ছিল না।

কোনটা?

আপনার বিয়েতে দাওয়াত দিলেন না। এটা কিন্তু কমপ্লিটলি আনএক্সপেক্টেড।

দাওয়াত দেয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। পুরোটা শুনলে বুঝতে পারবেন। আর শুভ ভাই, এটা তেমন বিয়ে না। আপনি শুনলে হাসবেন।

আচ্ছা শুনি না। বলেন।

জীবন বলে তার কাহিনী। খানিকটা ফেসবুকের চ্যাটবক্সে, খানিকটা ফোনে আর খানিকটা দেখা করে। ভেঙে ভেঙে বলে জীবন।

শুভ ভাইয়া, আপনি তো জানেন আমি কী করি। টিভিতে টিকআর পড়েন না? ব্রেকিং নিউজ, অনুষ্ঠানের খবরের নিচে একটা লাইন ধরে চলে যায় যে, ওটা আমি চালাই। আপনি কত ঘণ্টা অনলাইনে থাকেন সর্বোচ্চ বলেন তো। আমি মাঝে মাঝে ২০ ঘণ্টাও থাকি। একটা টিকআর চালু করে কত ঘণ্টা আর ঝিম মেরে বসে থাকি বলেন। ঘুমও আসে না। ঘুমানো কি উচিত বলেন। আপনি টিভির টিকআর পড়েন? খুব মজার জিনিস কিন্তু এই টিকআর। আপনি এমটিভির টিকআর পড়বেন যদি কখনো টিকআর পড়ার ইচ্ছা হয়। আমি প্রতিদিন নিয়মিত এমটিভির টিকআর পড়ি। আমাদের দেশের টিকআরগুলো নিউজ আর অনুষ্ঠানের ফোরকাস্ট ছাড়া কিছু দেয় না। এমটিভির টিকআর দেখবেন। প্রতিদিন আলাদা অচেনা হাসির সব বিষয় থাকে।

নেটে দিন নাই রাত নাই বসে থাকতে থাকতে হলে মানুষ কী করে। আপনাকে দেখি তো ফেসবুকে। আমিও থাকি। ফেসবুকে ঘাপটি মেরে থাকি। জিমেইলে কাছের বন্ধুরা ঘুমাতে যায়। তখন ফেসবুকে অচেনা আধাচেনা বন্ধুদেরই ভালো লাগে। ছেলে হোক মেয়ে হোক যাকে পাই তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেই। আপনাকে কত দিন ডিস্টার্ব করি না? কেন? ভালো লাগে না রে ভাই। একা একা বসে থাকতে একদম ভালো লাগে না।

জানেন তো, এখন সবার বাসায় বাসায় নেট চলে গেছে। মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে, রান্না খাওয়া সেরে আর টিভি দেখতে বসে না। সোজা ফেসবুকে এসে বসে থাকে। সুপারস্টারের সিনেমার চেয়ে আলাভোলা জ্যান্ত মানুষ অনেক মজার। বোঝেন তো?

রাতে আপনি অনেককে পাবেন। অফিসে অফিসে এখন ফেসবুক ব্যান। কাজ ফাঁকি দিয়ে ফেসবুকে আড্ডা চলবে না। এখন বসদের মনোযোগ ফেসবুক ব্লক করার দিকে। মানুষ কী করবে? ফেসবুকে না থাকলে তো সার্কেল থাকছে না। বন্ধুদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকা শহরের গ্রিডলক জ্যাম ঠেলে কেউ আর টিএসসি, শাহবাগ, মৌচাক মার্কেটে আড্ডা দিতে যায় না। বাসার পিসিতে নেট। সেখানেই চলে আড্ডা গুলতানি। রাতের বেলা নিয়ম করে আমিও বসি। বিশেষ করে রাতে শিফট থাকলে। ওই রাতের ফেসবুকে মাঝে মাঝে মাধবীকে দেখতাম। অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। মাধবীর অ্যালবামে একটাই ছবি। জীবনে বোধহয় ওই একবারই, ছবি তোলার সময়েই হেসেছিল। আপনি হাসছেন, পুরোটা বললে বুঝবেন। শুভ ভাই, বড় দুঃখের কাহিনী। মাধবীর সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ হতো। অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। জিজ্ঞেস করতাম নানা কথা। অস্ট্রেলিয়া কেমন, সে কী করে– এসব। মাধবী কিছু বলতে পারত না। আমার খুব সন্দেহ হলো, মনে হলো, নিকটা আসল নয়। সে হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় থাকে না। অ্যালবামে একটা ছবি, যেখানে থাকে বলে স্টেটাস লিখেছে সেখানকার কোনো কিছু জানে না। খুব অবাক লাগল। আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। বললাম, আপনি কী

করেন বলেন তো? ঢাকায় কোথায় থাকেন? মাধবী বলে, আপনিও বিশবাস করতে পারলেন না আমাকে?

আপনিও মানে কী?

মানে কেউ বিশবাস করে না। কিন্তু যখন পুরো গল্পটা শোনে তখন সবার আগ্রহ হারিয়ে যায়।

শুনলে আপনিও আর আগ্রহ পাবেন না। চলে যাবেন।

যদি না যাই?

মাধবী কী ভাবে জানি না। ওর গল্পটা আমাকে বলতে শুরু করে।

আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন, শুভ ভাইয়া, মাধবী অস্ট্রেলিয়ায় থাকে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া কোনোদিন দেখে নাই। দুনিয়া দেখার ইচ্ছা নিয়ে ওর দুটি চোখ আছে। কিন্তু দেখার জন্য চোখ যথেষ্ট না, সবচেয়ে জরুরি দুটি পা। ওর পা নেই। ছোটবেলা পোলিও হয়েছিল। দুটি অপুষ্ট পা নিয়ে সে বড় হয়েছে। দেশ বলতে ওর কাছে একটা ঘর চারটা দেয়াল একটা বারান্দা। মানুষ বলতে আত্মীয়-স্বজন। এভাবেই চলছিল। মা মারা গেলে, ভাই নিয়ে গিয়ে সিডনিতে নিজের কাছে রেখেছে। ভাই-বৌদির সংসারে আরেকটা চার দেয়ালে মাধবীর জায়গা হয়েছে। ভাই বলেছিল, ওখানে চিকিৎসা হবে। নিদেনপক্ষে দুটো কৃত্রিম পা জোগাড় হবে। কিন্তু এক বছর গেলেও কিছু হয়নি। একা একা সুন্দর একটা বাড়িতে হুইল চেয়ারে বসে কাটায় দিন। আর ফেসবুকে বসে থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় সূর্য ওঠে আমাদের অনেক আগে। তখন থেকে সেদেশের মানুষ জেগে ওঠার অপেক্ষা করে। ফেসবুকে কথা বলবে বলে। মানুষের সঙ্গে কথা বলে।

মাধবীর কাছ থেকে আমি জীবনের দক্ষিণ মেরুর গল্প শুনি। আমাদের সব গল্পই উত্তর মেরুর। মাধবীর মতো মানুষেরা দক্ষিণ মেরুর। আমাদের এখানে যখন গ্রীস্ম তখন ওদের শীত, ওদের যখন গ্রীস্ম আমাদের তখন শীত। কিন্তু সময় কিছুটা এগিয়ে। ওরা আমাদের আগে সূর্য দেখে।

শুভ ভাইয়া, আমি বলতে পারব না কেন যেন মাধবীর প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ তৈরি হলো আমার। আমি ওর কথা শুনতে থাকলাম। গভীর রাত জেগে মাধবী আমার সঙ্গে কথা বলত। একটা আকর্ষণ তৈরি হলো। মাধবী জীবনে কোনো পুরুষ দেখেনি। প্রেম কেমন জানেনি। যে বয়সে মানুষ শরীর সম্পর্কে জানে, অপরের শরীর আবিস্কার করে সে বয়স তার পেরিয়ে যাচ্ছে। তবু মাধবীর কিছুই জানা হয়নি।

আমি বললাম, মাধবী তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করো। আমি তোমাকে বিয়ে করব।

মাধবী ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করল।

খুব স্বাভাবিকভাবে ভাই বিশবাস করতে পারল না আমাকে। পা-বিহীন মাধবী দেশে এসে সংসার করবে এমন অলীক কল্পনা তার বিশবাস হলো না। আর ফেসবুক ভার্চুয়াল সম্পর্ক এগুলো তো কোনো কাজের কথাই না।

মাধবীর সঙ্গে প্রেম শুরু হলো। আমি তার প্রথম পুরুষ। পুরুষ কী সে জানে না। আমি তাকে পুরুষের গল্প বলি। পুরুষের জগৎ সম্পর্কে ধারণা দিই। পুরুষ কেমন করে জানাই। সে আস্তে আস্তে পুরুষকে জেনে যায়।

মাধবী বলে সে আমাকে স্পর্শ করতে চায়। আমি বলি, আমি এত দূরে। আমার বর্ণনা শুনে সে আমাকে কল্পনা করে। ফোনে কথা বলে আমার নিঃশ্বাস মুখস্থ করে। বলে তোমার ঘ্রাণ আমি বুঝতে পারি। সে আমার ভাব বোঝে। আমার ব্যথা-বেদনা-অভিমান অনুভব করে।

তারপর একদিন সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। বলে, স্টেটাস চেঞ্জ করে সে আমাকে বিবাহ করতে চায়। বলে, জীবন, হয়তো তোমাকে দেখব না কোনোদিন। তোমাকে স্পর্শ করব না। কিন্তু তুমি আমার পুরুষ। হয়তো তুমি একদিন আমাকে ভুলে যাবে। একদিন কাউকে বিয়ে করে ফেলবে। তোমার সংসার, সন্তান হবে। আমি কিছু বলব না। তুমি শুধু স্টেটাস চেঞ্জ করতে দাও। কী মনে হলো, কী ভাবলাম জানি না। আমি বললাম আসো চেঞ্জ করি। একদিন খুব ভোরবেলা মাধবী ও আমার বিয়ে হলো। ভার্চুয়াল বিবাহ। আমরা ফেসবুকের দেয়ালে উৎসব করলাম। যন্ত্রগুলো সাক্ষী হলো। আমরা হাত ধরে ঘুরলাম। বাসর সাজালাম। ফোনে ফোনে কাঁদলাম। মাধবী বলল, আলিঙ্গন দাও। কল্পনা করো, তোমার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। না বসে আছি। হুইল চেয়ারে। তুমি হাঁটু গেড়ে বসে আছো। আমাকে ধরে আছো। আমাকে কি তোমার ঘৃণা হচ্ছে? আমাকে কি অর্ধেক মানুষ বলে মনে হচ্ছে? তুমি আমার পা। তুমি আমাকে তোমার পা দিয়ে বিশ্ব ঘোরাও।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে জীবন। আমি জীবনের হাত ধরি।

সান্ত্বনার ভাষা।

জীবন বলে, একদিন সে অস্ট্রেলিয়া যাবে। মাধবীকে নিয়ে বাগানের মতো অস্ট্রেলিয়া ঘুরবে। তাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসবে। একদিন তার ও মাধবীর সংসার হবে।

কান্না থামিয়ে জীবন আমার দিকে তাকায়। বলে, আপনার চোখের নিচে কালি পড়ে যাচ্ছে শুভ ভাই। অর্থাৎ আপনি পানি কম খাচ্ছেন। হজমে সমস্যা হচ্ছে। জানেন তো, মানুষের মুখ দেখলে তার শরীরের সমস্ত অসুখ বলে দেয়া যায়। আপনি বেশি করে পানি খান শুভ ভাইয়া। পানি না খেলে মানুষের সুস্থতা অসম্ভব।

আপনি কি জানেন শুভ ভাইয়া, এই যে স্টারদের আমরা দেখি। যাদের দেহ, ত্বক আমাদের পরম আরাধ্য। তাদের মূল খাবার কী? পানি।

আপনি জেনে অবাক হবেন ঐশবরিয়া রাই দিনে প্রায় তিন লিটার পানি খায়।

তুমি পথচারিণীর ক্লান্তি নিয়ে এসেছো কি

তিন মাস পর তিন্নি ফোন করেছে। বন্ধু। এই একটা কথা বলার পর থেমে আছে। চুপ করে আছে।

বলো।

কী বলব?

কেন ফোন করেছ?

কেন, আমি ফোন করতে পারি না?

তা তো পারোই। কিন্তু করো না তো।

তুমি করো? আমি বুইঝা উঠতে পারি না শুভ, তুমি এত বছরের একটা সম্পর্ক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে শেষ পর্যন্ত একটা শরীরের বন্ধনে এনে বেঁধে ফেললা কেমনে।

আমি এ রকম করেই ভাবি। আমার মনে হয়, তুমি আমার নও। মনে হয়, তোমার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই।

চুমো দিলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে?

হবে।

ওকে। বলো কোথায় আসতে হবে। কবে দেখা করবে বলো।

এই অনুভব কি তোমার ভেতর থেকে এসেছে?

দেখো। আমি অনেক ভাবলাম এই কয় মাসে। আমি তোমাকে হারাতে চাই না। আমি কখনো চাইনি যে তোমার সঙ্গে এমন সম্পর্ক হোক। কারণ আমি জানি, একবার রহস্য খুলে গেলে আর আমার প্রতি তোমার কোনো আকর্ষণ থাকবে না।

এইটা ঠিক না। দেখো আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক থাকবে।

বলো কবে কোথায় কীভাবে দেখা করবে?

রওনক আর নওরোজ নেপাল গেছে। হয়তো এখন তারা কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দলে ভিড়ে শাং-রি-লার সন্ধানে হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে। অপূর্ব অসাধারণ রওনক। আমার সব গল্প ওকে বলেছি। সুপর্ণা ও তিন্নির কথাও। রওনক বলেছে, তিন্নির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে সে বড় একটা পার্টি দেবে। রওনক পৃথিবীতে বিরল সেই মানুষদের দলে। ঈর্ষা যাদের স্পর্শ করেনি। স্বামীর প্রেমিকাদের সে ভালোবাসে, প্রেমিকের প্রেমিকাদেরও ভালোবাসে। রওনক হলো চিরযৌবনা ক্ষিপ্র সেসব খাপখোলা তলোয়ার, সময় যাদের গায়ে সামান্য মরিচা ফেলতে পারেনি।

আমি রওনককে বলি, ধরো তিন্নি যদি কোনো দিন এসে আমাকে বলে, তুমি শুধু আমার।

তুমি শুধু তারই হবে।

তোমার কোনো দাবি থাকবে না?

বন্ধু হবে। আমরা শুধু বন্ধু হবো।

তাই?

শোনো যৌবন তো চিরদিনের নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব চিরদিনের। যৌনতা আজ আছে, কাল থাকবে না। কিন্তু বন্ধুত্ব থাকবে।

তিন্নিকে আমি বলি। তিন্নি তুমি শুক্রবার সকালে বাসায় এসো।

আসলাম।

আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াব।

দাওয়াত?

ধরে নেও।

ভালো প্রস্তাব। আসলাম।

তোমারে বিশবাস পাই না বন্ধু। তুমি শেষ মুহূর্তে আইসা বলবা তোমার মাথা ব্যথা। আসতে পারবা না।

শুক্রবার আসুক। দেখা যাবে।

একটা দীর্ঘ সপ্তাহ চলে যায়। শুক্রবার আসতে তিন দিন যেতে তিনশ' দিন সময় লাগে। পুরো একটা বছরের মতো তিন দিন চলে যায়। মনে হয় একটা জীবন ধরে তিন দিন চলে যাচ্ছে।

আমি ভাবতে থাকি তিন্নিকে বহুল প্রত্যাশিত সেই চুমো দিচ্ছি। তিন্নিকে বলছি, তুমি আমার তিন্নি। ভাবছি। ভাবতে ভাবতে দিকদিশাহারা হয়ে পড়ছি।

বৃহস্পতিবার শহরে খুব ভিড়। সর্বত্র অসংখ্য মানুষ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তারা বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে কোনো ভিআইপির জন্য সারে সারে মানুষ দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। তিনি একেকটা কারে করে চলে যাচ্ছেন। লোকে একটা বাস দেখলে ছুটে যাচ্ছে। ঘর্মাক্ত মানুষে ঠাসা একটা বাস এসে থামছে। ওর মধ্যেই জানবাজি রেখে উঠে পড়ছে একেকজন। কে বলবে, একটা মহামারীর দায় মাথায় নিয়ে লোকগুলো একে অন্যের ঘাম সর্দি, জ্বর মাখামাখি করে নিচ্ছে। আমিও দাঁড়িয়ে আছি অনন্ত মানুষের ভিড়ে। মনে হচ্ছে, আমার জ্বর এসেছে। জোরে কয়েকটা হাঁচি এলো। আশপাশের মানুষের চোখে ভয়। আজ কয়দিন শহরে মানুষের মুখে মুখে মাস্ক। নতুন এক ফ্লু এসেছে। সোয়াইন ফ্লু। বিশেষজ্ঞরা নাকি অনেকদিন ধরে আভাস দিচ্ছেন, একটা মহামারী হবে। সমস্ত পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষ মরে যাবে। একশ' বছর পরপর এমন মহামারী আসে। লাখ মানুষের প্রাণ নিয়ে চলে গিয়ে এই পৃথিবীতে সম্পদ ও মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। অবশেষে সেই ফ্লু এলো। শূকরের দেহের ভাইরাস মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে মানুষে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে।

শত শত মানুষের মৃত্যুসংবাদ আসছে। বাংলাদেশেও মরেছে কয়েকজন। একটা ভয় আমার দেহে ভর করে। আমি কেঁপে উঠি। অনেক সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বাসে উঠি রাত ১০টার পর। বাসে উঠতে পারি। আজ আর রান্নার অবকাশ নেই। হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরে বসে থাকি। সর্দি লেগে গেছে। জ্বর বাড়ছে। প্যারাসিটামল খাওয়া ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছি না। সোয়াইন ফ্লু হলে কি প্যারাসিটামল খাওয়া যায়। ডেঙ্গু হলে নাপা খাওয়া যায় না, শুনেছি। কিন্তু সোয়াইন ফ্লু হলে। ইন্টারনেটে সার্চ দেই। সোয়াইন ফ্লুর লক্ষণ কী কী? সর্দি, ঘাড় ব্যথা, জ্বর। এটুকু জানার পর ঘাড়ে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করতে থাকলাম। শরীরে র‍্যাশ উঠছে। জানি না কী করব।

তিন্নি কাল সকালে আসবে। ওকে বলে দিলে হয় যাতে না আসে। কিন্তু ও এলে মৃতপ্রায় আমাকে অনন্ত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারবে। আজ আর ফোন দেবো না। অযথা টেনশন করবে। কাল সশরীরে এসে দেখে যাক।

আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। এভাবে একটা ফ্লুতে মরে যাব? নিজের ভবিতব্যের কথা ভাবি।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেলে একটা বমি বমি ভাব জাগে। বমি হলে আর রক্ষা নেই। নিশ্চিত ফ্লুর ওষুধ খেতে হবে। বেসিনে গিয়ে গলা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পেটে মোচড় আসে। কিন্তু বমি হয় না।

তিন্নি ৯টায় আসে। আমার অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠে। বলে কী হইছে তোর।

আমার ধারণা সোয়াইন ফ্লু।

কী বলিস! দেখি।

তিন্নি কপালে হাত দেয়। হ্যাঁ একটু একটু জ্বর আছে। শোন মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আয় তো। তোর জন্য নাশতা এনেছি। তিন্নি পরোটা, ভাজি, মাংস প্লেটে রেডি করে।

এক কাজ কর, সেভ করে গোসল করে এসে বস। আমি চায়ের পানি উঠিয়ে দিই।

তিন্নির কথামতো আমি গোসল করে আসি। দেখ জ্বর চলে গেছে। নাশতা করে চা নিয়ে দু'জন বিছানায় পাশাপাশি বসি।

একটা কথা সত্যি করে বল তো, তুই কি মার্কেজের কোনো বই পড়ছিলি?

না তো। কেন?

লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা?

না। নেভার।

তাহলে মিলে গেল কেন? শোন তোর কিচ্ছু হয়নি। সোয়াইন ফ্লু কিচ্ছু না। তোর যেটা হইছে, সেইটার নাম প্রেম। বমি বমি ভাব হইছে না সকালে?

হু। তুই কেমনে জানলি?

প্রেম হলে এ রকম হয়।

ঘাড়ে ব্যথা?

হ্যাঁ।

প্রেমের লক্ষণ।

সর্দি তো নাই দেখি।

গত রাতে ছিল।

সব মিলে গেছে।

তিন্নি আর আমি অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকি। কথা বলি না। তিন্নি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

কী জন্য ডাকছিলি বল তো?

কী জন্য?

জ্বরের ঘোরে ভুলে গেছিস।

রান্না করে খাওয়ানোর কথা না?

হু।

আর?

এইবার জ্বরের ঘোরের মধ্যে আমার মনে পড়ে তিন্নিকে চুমো খাওয়ার কথা। কিন্তু আমি ওর হাত স্পর্শ করার মতো সাহসও পাই না।

কাপে চুমুক দিতে গেলে তিন্নি খেয়াল করে আমার হাঁত কাঁপছে।

কিরে হাত কাঁপে কেন?

জ্বর তো।

জ্বরে কি মানুষ কাঁপে নাকি এমনে? তোর কি ম্যালেরিয়া জ্বর নাকি।

তিন্নি আমার হাতটা হাতে নেয়।

হার্টবিট দেখি তো। মাই গড, এত জোরে হার্টবিট হচ্ছে কেন?

দেখি তো। সে বুকে কান পাতে।

তোর প্রাণপাখি তো উইড়া যাইতে সময় নেবে না।

সবই তোর জন্য হচ্ছে।

বুঝছি, ওইটুকু বোঝার ক্ষমতা হইছে।

আমি চুপ করে থাকি। তিন্নি আমার মুখটা দু'হাতে তুলে নেয়। ঠোঁটে একটা চুমো দেয়।

তোর সোয়াইন ফ্লু হবে।

হোক।

আবার সে আমার দিকে তাকায়।

আমার ঠোঁটের দিকে ঠোঁট বাড়াতেই ঝলক দিয়ে আমার সামনে একটা দৃশ্য উপস্থিত হয়। আমি লক্ষ্য করি, তিন্নি আমাকে না সুপর্ণাকে চুমো খাচ্ছে। আর আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি।

আমার খুব জ্বর আসে। অনেকদিন পর, ছোটবেলার পর আবার আমার জ্বর আসে। চৈত্রের খা খা মাটিফাটা দুপুরের মতো প্রচণ্ড জ্বর আসে আমার। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে জ্বর ভেঙে গেলে দেখি আবছা একটা ছায়ামূর্তি আমার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। আমি জাগলে সে আমাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে। জ্বর হলে যেভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

<শেষ>

ফেস বাই ফেস